বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ৫৫-৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য: সমাধান কোন্ পথে?

মইনুল ইসলাম*

মূল শব্দ: *বঙ্গবন্ধু, বিপ্লবাত্মক প্রয়াস, নরঘাতক, ক্রোনি ক্যাপিটালিজম, পুঁজি লুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র, ব্রিকস, ১১ উত্থানশীল অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ধনকুবের প্রবৃদ্ধির শীর্ষে বাংলাদেশ, ঠুঁটো জগন্নাথ, 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব'*

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমস্যার স্বরূপ

২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল নির্ধারিত 'স্বল্পোন্নত দেশের' ক্যাটেগরি থেকে 'উন্নয়নশীল দেশের' ক্যাটেগরিতে উত্তরণের ছয় বছরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এবং ঐ প্রক্রিয়ার সফল পরিসমাপ্তির পর ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের 'নিম্ন আয়ের দেশ' ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশ 'নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ' ক্যাটেগরিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছে গেছে বলে সরকারি প্রাক্কলন ঘোষিত হয়েছে, যার ফলে জাতিসংঘের এবং বিশ্ব ব্যাংকের উল্লিখিত দুটো বিন্যাস পদ্ধতিতে উচ্চতর পর্যায়ে বাংলাদেশের উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। এই উত্তরণ সারা বিশ্বের উন্নয়ন চিন্তকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে এই নব্য-স্বাধীন দেশটি অর্থনৈতিকভাবে আদৌ টিকে থাকতে পারবে কি না তা নিয়ে বিশ্বের অনেক উন্নয়ন-অর্থনীতিবিদ ও ওয়াকিবহাল মহলের গভীর হতাশা ছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে জনসন নামের যুক্তরাষ্ট্রের একজন কূটনীতিক যখন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ 'ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট কেস' হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের তদানীন্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পরে (১৯৭৩ সাল থেকে) যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিঞ্জার তাতে সায় দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকা 'ইন্টারন্যাশনাল বটমলেস বাস্কেট' নাম দিয়ে বাংলাদেশের এই অপমানজনক অভিধাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে

---

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ফোন: ০১৭১১১৬৫৬১২, ই-মেইল০: dr.muinul@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশে আয় ও ধন বৈষম্য" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে পঠিত, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

বারবার ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের ওপর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ইউস্ট ফালান্ড ও জন পারকিনসনের বিশ্বখ্যাত গবেষণাগ্রন্থটির নামই ছিল ***বাংলাদেশ—এ টেস্ট কেস অব ডেভেলপমেন্ট***। ঐ বইয়ের পঞ্চম পৃষ্ঠায় রচয়িতাগণ দাবি করছেন,

If the problem of Bangladesh can be solved, there can be reasonable confidence that the less difficult problems of development can also be solved. It is in this sense that Bangladesh is to be regarded as the test case (Faaland & Parkinson, 1975, P. 5).

পরিষ্কারভাবে এই দুজন উন্নয়ন-গবেষক বলছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ঐ পর্যায়ে তাঁদের বিবেচনায় খুবই কঠিন মনে হয়েছে। হয়তো খোদ বঙ্গবন্ধুর মনোজগৎ এবং চিন্তা-চেতনায়ও অর্থনীতির হতাশাজনক অবস্থার ছাপ পড়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারি ও ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশে মার্কিন ঋণ-অনুদান গ্রহণ না করার পক্ষে অবস্থান নিলে বঙ্গবন্ধু ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি থেকে বৈদেশিক ঋণ/অনুদান গ্রহণে তাঁর সরকারের বাছবিচার করার প্রাথমিক দৃঢ় অবস্থানকে পরিবর্তনের মধ্যেও হয়তো এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল অনেকটাই। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার অনেক সাধ্য-সাধনা করে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের 'স্বল্পোন্নত দেশের' ক্যাটেগরিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছিল, যাতে বাংলাদেশ এর ফলে বৈদেশিক অনুদান, খাদ্য সহায়তা এবং 'সফট লোন' পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা পায়। স্বীকার করতেই হবে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে চরম খাদ্যশস্য ঘাটতি এবং বিশেষ করে ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের কারণে বঙ্গবন্ধু ঐ পর্যায়ে বৈদেশিক অনুদান ও ঋণকে অপরিহার্য বিবেচনা করেছিলেন। একইসাথে এটাও বলতে হবে, বঙ্গবন্ধু স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদাহীন ইমেজের ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। তাই, তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এক দশকের মধ্যেই বাংলাদেশকে ঐ অপমানজনক অবস্থান থেকে বের করে আনবেন। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিপ্লবাত্মক প্রয়াসও শুরু করেছিলেন তিনি, কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নরঘাতকেরা সপরিবার তাঁকে হত্যা করে ঐ প্রয়াসকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। (১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে আমন ধান কাটার পর বাম্পার ফসলের প্রভাবে সাময়িকভাবে চালের দাম অনেক কমে গিয়েছিল।) এরপর বাংলাদেশের সমরপ্রভুদের অবৈধ সরকার বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বর্ধিত বৈদেশিক সহায়তার লোভে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে উত্তরণকে সযতনে এড়িয়ে চলেছে। পরবর্তী ৪৩ বছর বাংলাদেশ 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' লুটেরা শাসনব্যবস্থার জালে বন্দী থাকার কারণে এক দশকের স্থলে বাংলাদেশের ৪৩ বছর লেগে গেছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সোপানে পৌঁছানোর জন্যে। বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান সংগ্রহের বিশেষ পারঙ্গমতা ও দক্ষতাকেই জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ অর্থমন্ত্রী ও অর্থনীতিসংক্রান্ত উচ্চতম পদমর্যাদার আমলাদের মেধার পরিচায়ক মনে করতেন। দুর্ভাগ্য, গত ২৮ বছরের ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছে। বিএনপি সরকারগুলোর সময় দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী প্রয়াত সাইফুর রহমান এ বিষয়ে প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, 'যদ্দিন সাইফুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকব, তদ্দিন এ দেশের টাকার অভাব হবে না।'

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত দ্রুত বদলাতে শুরু করেছিল। ২০১১ সালে বিশ্বখ্যাত মার্কিন দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অগ্রযাত্রার বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এ-বিষয়ে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ২০১২ সালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্থানে অবস্থানকারী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দ্য ইকোনমিস্ট' নিশ্চিত করল যে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের অর্থনীতি

উন্নয়নের এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখান থেকে অর্থনীতিবিদেরা প্রকৃতপক্ষেই আশাবাদী হয়ে উঠছেন যে বাংলাদেশ ক্রমেই অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠছে। ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ব্রিটেনের আরেকটি খ্যাতনামা দৈনিক পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি ইউরোপের প্রধান প্রধান কয়েকটি অর্থনীতিকেও ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা দিলেন, ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও মানব উন্নয়নের অনেকগুলো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অর্জন ভারতের চেয়ে ভালো। এর কিছুদিন পর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষক সংস্থাগুলোর অন্যতম গোল্ডম্যান স্যাক্স 'ব্রিকস' (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) নামে অভিহিত বিশ্বের দ্রুত উত্থানশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ঠিক পেছনে অবস্থানকারী 'পরবর্তী ১১ উত্থানশীল অর্থনীতির' তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ ডাইমেনশন বাংলাদেশের অর্থনীতির এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে ধারণ করছে সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬' মোতাবেক ২০১৬ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার (মৌল প্রয়োজনসমূহের খরচ পদ্ধতি [কস্ট অব বেসিক নিডস বা সিবিএন] অনুসরণে পরিমাপকৃত) নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত মাত্র ২৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০১০ সালে 'খানা আয়-ব্যয় জরিপে' দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৩১.৫ শতাংশ, ২০০৫ সালের জরিপে ঐ অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশ, আর ২০০০ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ। ১৯৯০ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৮ শতাংশ, এক নম্বর 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' অনুযায়ী ওখান থেকে ২০১৫ সালে তা অর্ধেকে নামানোর লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ দু বছর আগে ২০১৩ সালেই অর্জন করে ফেলেছে।

২। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছর থেকে ১৯৮১-৮২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপির অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য ১০ শতাংশের বেশি ছিল এবং ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে ঐ অনুপাত ১৩.৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল বলে প্রফেসর রেহমান সোবহান প্রণীত ১৯৮২ সালে প্রকাশিত বই *দ্য ক্রাইসিস অব এক্সটারনাল ডিপেন্ডেন্স*-এর নবম পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে। নিচে উপস্থাপিত সারণি-১ এর তথ্য-উপাত্তে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রধানত জিয়া আমলের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তা-নির্ভরতার করুণ চালচিত্রটি ফুটে উঠেছে। জিয়া সরকার ১৯৭২-৭৫ পর্বের বঙ্গবন্ধু সরকারের চেয়ে অনেক বেশি বৈদেশিক সহায়তা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে। ফলে, ঐ সময়েই বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক অনুদান ও ঋণনির্ভরতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। গত ৩৭ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর এ দেশের অর্থনীতির নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ১ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। (অবশ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কয়েকটি মেগা প্রকল্পের কারণে বৈদেশিক ঋণপ্রবাহ খানিকটা বেড়েছে)। আরও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ঐ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের মাত্র ২ শতাংশের মতো ছিল খাদ্যসাহায্য, আর বাকি ৯৮ শতাংশই ছিল প্রকল্প ঋণ। এখন বাংলাদেশ আর পণ্য সাহায্য নেয় না। এর তাৎপর্য হলো, বৈদেশিক ঋণ-অনুদানের ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতির টিকে থাকা না থাকা এখন আর কোনোভাবেই নির্ভর করে না। বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বাংলাদেশ যে বৈদেশিক সাহায্য পেত, গড়ে তার ২৯.৪ শতাংশ ছিল খাদ্যসাহায্য, ৪০.৮ শতাংশ ছিল পণ্যসাহায্য, আর ২৯.৮ শতাংশ থাকত প্রকল্প সাহায্য (রেহমান সোবহান,

প্রাগুক্ত, [১৯৮২] পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য)। সারণি-১ দেখাচ্ছে, ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর বাংলাদেশের আমদানি বিলের ৭১.১৭ শতাংশই পরিশোধ করতে হয়েছিল বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ দিয়ে। ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ১০৪.৮ শতাংশ এবং ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর উন্নয়ন বাজেটের ৯৭.৮৩ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীল ছিল (তার মানে, ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর সরকারের পৌনঃপুনিক ব্যয়ের অংশবিশেষও বৈদেশিক সহায়তার অর্থে মেটাতে হয়েছিল!)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন বাজেটের বৈদেশিক ঋণ/অনুদাননির্ভরতা এক-তৃতীয়াংশেরও নিচে নেমে গেছে। বৈদেশিক সাহায্যের অপরিহার্যতা সম্পর্কে একটা জুজুর ভয় দেখানো হতো, কারণ বৈদেশিক সাহায্য দুর্নীতির একটি সিস্টেম বা জালকে লালন করে থাকে। উপরন্তু, গত চার দশকে বাংলাদেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করা এনজিওগুলো বৈদেশিক সাহায্যের জন্যে লালায়িত। এখন যখন খাদ্যসাহায্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে এবং পণ্যসাহায্য আর নিতে হচ্ছে না তাহলে বৈদেশিক সাহায্যকে বাংলাদেশের জনগণের জীবন-মরণের সমস্যা হিসেবে দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশ এখন আর খয়রাতনির্ভর দেশ নয়; এটা এখন একটি বাণিজ্যনির্ভর দেশে পরিণত হয়েছে।

সারণি-১: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তার করুণ চালচিত্র: ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮১-৮২ অর্থবছর

বৈদেশিক সহায়তার অনুপাতসমূহ	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২
১। জিডিপির শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৮.৩	১১.৮	১১.৬	১২.২	১০.৫	১৩.৭
২। আমদানি বিলের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৬৭.৯০	৬৬.৩৮	৭১.১৭	৫৭.৬১	৫৩.৮৯	৬১.০৬
৩। মোট বিনিয়োগের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৭৭.৬৭	৭৫.৮৩	৮৩.৩৫	৬৪.৮৭	৫৫.৫৬	৬৪.৯২
৪। উন্নয়ন বাজেটের শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	৮১.৯৭	১০৪.৮	৯৭.৮৩	৮১.১৭	৭৯.১৩	৭৮.২৬

সূত্র: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিতব্য লেখকের গ্রন্থ *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment* এর সারণি-৬.২। ঐ সারণিটি (রেহমান সোবহান, ১৯৮২)-এর নবম পৃষ্ঠার সারণি ১.২ থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত।

৩। গত দু বছর বাদে এক দশক ধরে প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশ তার লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্জন করে চলেছে। এর মানে, বাংলাদেশ এখন তার আমদানি ব্যয় আর রপ্তানি আয়ের ব্যবধানটা প্রায় বছর মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। নিদেনপক্ষে, বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি এখন আর সংকটজনক নয়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ পথে প্রেরিত রেমিট্যান্সের চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধির হার এবং বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বছরের পর বছর অব্যাহত চলমান প্রবৃদ্ধি দেশের লেনদেন ভারসাম্যের এই স্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে। গত ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় প্রতিবছর বেড়েই চলেছে, এবং ২০১৯ সালের মার্চের শেষ নাগাদ এই রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল যা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

৪। জনসংখ্যার অত্যন্ত অধিক ঘনত্ব, জমি-জন অনুপাতের অত্যল্পতা এবং চাষযোগ্য জমির ক্রম-সংকোচন সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করে এখন ধান-উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ছিল মাত্র ১ কোটি ১০ লাখ টন, ২০১৮ সালে

তা সোয়া তিন গুণেরও বেশি বেড়ে ৩ কোটি ৬২ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। ধান, গম ও ভুট্টা মিলে ২০১৮ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ টন। ৭০ লাখ টন আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিপরীতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ১ কোটি ৫ লাখ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। (এখনো আমরা অবশ্য প্রায় ৫০/৫৫ লাখ টন গম আমদানি করি।) মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। তরিতরকারি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। সারা বিশ্বের দৃষ্টিতেই কৃষি উৎপাদনের এই সাফল্য চমকপ্রদ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। খাদ্যশস্য, মাছ, তরিতরকারি উৎপাদনের এই সাফল্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সার্বিক খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে, এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এটাও খুবই গুরুত্ববহ যে, আকস্মিক খাদ্যসংকট মোকাবিলার জন্যে ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্যের বিশাল মজুদও গড়ে তোলা হয়েছে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই।

৫। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় প্রতিবছর বেড়েই চলেছে, এবং গত এক দশক গড়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশের মতো। নিচে উপস্থাপিত সারণি-২ এর তথ্য-উপাত্তে অর্থনীতির এই ক্রমবর্ধমান গতিশীলতা ও রূপান্তরের চিত্রটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক ও সূচকের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। (অবশ্য, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশনার কারণে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরগুলোর তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি।) সাম্প্রতিক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ, এবং ২০১৮-১৯ অর্থছরে তা ৮.১৩ শতাংশ হয়েছে বলে সরকারিভাবে প্রাক্কলিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিএনআই প্রাক্কলিত হয়েছে ১৯০৯ ডলার। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারের বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম গতিশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষত লক্ষণীয়, সারণির ৪ নম্বর আইটেমে জিডিপির খাতওয়ারি হিস্যার পরিবর্তন অর্থনীতির রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করছে, যেখানে শিল্পখাতের অবদান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির ৩২.৪২ শতাংশে পৌঁছে গেছে। সারণির ৫ নম্বর আইটেমে বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ৩০.৫১ শতাংশে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটিও খুবই আশাপ্রদ। বিশেষত, এই এক দশকে সরকারি বিনিয়োগ ২০০৭-৮ অর্থবছরের জিডিপির মাত্র ৪.৫০ শতাংশের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.৪১ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি প্রশংসার্হ। এটাও আন্দাজ করা যায় যে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে ৭.৮৬ শতাংশ এবং ৮.১৩ শতাংশে পৌঁছানোয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ আরও বেড়েছে, বিশেষত সরকারি বিনিয়োগ।

৬। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৪২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, অথচ ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৭৫২ মিলিয়ন ডলার। শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই আসছে বুনন ও বয়নকৃত তৈরি পোশাক খাত থেকে। চীনের পর বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। (মাঝে মাঝে ভিয়েতনামও দ্বিতীয় অবস্থানে চলে যায়।) সস্তা শ্রমশক্তির কারণে তৈরি পোষাকের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশের সুবিধেজনক অবস্থান অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে আবারো সঞ্জীবিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক পণ্য, জাহাজ নির্মাণ ও কৃষিভিত্তিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি বাজারে ভালোই সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

সারণি-২: বাংলাদেশের অর্থনীতির সাম্প্রতিক রূপান্তরের কয়েকটি নির্দেশক: ২০০৭-৮ অর্থবছর থেকে এক দশক

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক		কয়েকটি নির্বাচিত অর্থবছর			
		২০০৭-৮	২০০৯-১০	২০১৩-১৪	২০১৬-১৭
১।	মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৬৩৭	৭৮০	১১১০	১৫৪৪
২।	মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলার)	৬৮৬	৮৪৩	১১৮৪	১৬১০
৩।	স্থির দামে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	৬.০১	৫.৫৭	৬.০৬	৭.২৮
৪।	স্থির দামে জিডিপির খাতওয়ারি শেয়ার (%)				
	কৃষিখাত	১৮.৬৮	১৮.৩৮	১৬.৫০	১৪.৭০
	শিল্পখাত	২৬.১৩	২৬.৭৮	২৯.৫৫	৩২.৪২
	সেবাখাত	৫৫.১৯	৫৪.৮৩	৫৩.৯৫	৫২.৮৫
৫।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ	২৬.২০	২৬.২৫	২৮.৫৮	৩০.৫১
	প্রাইভেট খাতের বিনিয়োগ	২১.৭০	২১.৫৭	২২.০৩	২৩.১০
	সরকারি বিনিয়োগ	৪.৫০	৪.৬৭	৬.৫৫	৭.৪১
৬।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৯.১৯	২০.৮১	২২.০৯	২৫.৩৩
৭।	জিডিপির শতাংশ হিসেবে জাতীয় সঞ্চয়	২৭.৭৯	২৯.৪৪	২৯.২৩	২৯.৬৪

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১১.০১, পৃ.৪০৯।

৭। বাংলাদেশের ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি মানুষ বিদেশে কাজ করছেন ও বসবাস করছেন। (গণনাবহির্ভূত আরও অনেক অভিবাসী বিদেশে কাজ করছেন বলে ধারণা করা হয়)। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের অভিবাসীদের সিংহভাগ অবস্থান করছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরও বাংলাদেশি অভিবাসীদের বড় গন্তব্যস্থল। বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসতি ক্রমশ বড় হয়েই চলেছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদিও কম দক্ষ শ্রমজীবী; তবু গত তিন দশক ধরে প্রতিবছর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েই চলেছে, এবং ২০১৮ সালে নিয়মানুগ মাধ্যমে বা প্রাতিষ্ঠানিক পথে (formal channels) রেমিটেন্স প্রবাহ ১৫৪২ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, হুন্ডির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণও বেশ বড়। হয়তো এর পরিমাণ ৮-১০ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ। (এ ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক পথে সমান্তরাল অর্থনীতিতে ঠেলে দেওয়া বৈদেশিক আয় প্রধানত চোরাচালান অর্থায়ন, পুঁজি পাচার, কালোটাকা ধোলাই, ধনাঢ্য বাংলাদেশিদের পুত্র-কন্যাদের বিদেশে পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহ, বিদেশে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ ও দ্রুত বেড়ে ওঠা ধনাঢ্য পরিবার গুলোর ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহে অপব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এ-অর্থের একাংশ বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের অবৈধ রেমিটেন্স এবং এ দেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত বিদেশি কোম্পানিগুলোর মুনাফা পাচারেও ব্যবহৃত হচ্ছে।)

৮। ক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনের সাফল্য গ্রামের ভূমিহীন নারীদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার একটা অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের জীবন ও জীবিকাকে এই ক্ষুদ্র ঋণ বেশ খানিকটা সহজ করে দিয়েছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এক-চতুর্থাংশের বেশি ঋণগ্রহীতা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে

সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্য, ক্ষুদ্রতরসংখ্যক ঋণগ্রহীতা সাফল্যের সাথে দারিদ্র্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পেরেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শুধু ক্ষুদ্র ঋণকে এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিস্টেম কর্তৃক লালিত দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবিলার যথার্থ প্রতিষেধক বিবেচনা করা সমীচীন নয়। কিন্তু, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছে দেওয়ার এই সফল উদ্ভাবনটিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক দিক উন্মোচনের কৃতিত্ব দিতেই হবে।

৯। দেশের দ্রুত বিকাশমান পোশাক শিল্পে ৪০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, আর এই শ্রমিকদের ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক অবস্থানের এসব নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতে কাজের ব্যবস্থা করাটা তাঁদের বঞ্চনা ও চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নিরোধক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতেই হবে, তৈরি পোশাক শিল্পখাত বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে।

১০। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ জাতিসংঘ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) ও টার্গেট অর্জনে ২০১৫ সালের বহু আগেই বাংলাদেশ নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেছে। এগুলো হলো দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লিঙ্গ-সমতা অর্জন, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যকর সেনিটেশন ব্যবস্থায় ব্যাপক অভিগম্যতা, শিশুমৃত্যু ও ছোট বালক-বালিকাদের মৃত্যুহার হ্রাস সম্পর্কিত লক্ষ্য ও টার্গেটসমূহ।

অতএব, স্বীকার করতেই হবে যে জিডিপি ও জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক গত দুই দশক ধরে সন্দেহাতীতভাবে জানান দিয়ে চলেছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে, যেটাকে ১৯৬০ সালে ওয়াল্ট রস্টো একটি দেশের অর্থনীতির 'টেকসই প্রবৃদ্ধির পানে উড়াল (take-off into sustained growth)' স্তর নামে অভিহিত করেছিলেন। (আমি অবশ্য রস্টোর তত্ত্বকে খুব গ্রহণযোগ্য মনে করি না। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, টেইক-অফের ধারণাটি এখনো উন্নয়ন ডিসকোর্সে প্রভাবশালী রয়ে গেছে।) কিন্তু, মাথাপিছু জিডিপি যেহেতু একটি গড় সূচক তাই মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে যদি দেশে আয়বন্টনে বৈষম্যও বাড়তে থাকে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে, যার ফলে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবৃদ্ধির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। অতএব, আয়বৈষম্য ক্রমে বাড়তে থাকার প্রবণতাকে দেশের আসন্ন মহাবিপৎসংকেত বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রবৃদ্ধির সুখবরের পাশাপাশি এই একটি মহাবিপদ যে এ দেশের ১৯৭৫-পরবর্তী শাসকমহল তাদের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক দর্শন ও উন্নয়নকৌশলের মাধ্যমে ডেকে আনছে তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের জন্যে আমি গত সাড়ে তিন দশক ধরে সর্বশক্তি দিয়ে জাতির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আশির দশক থেকেই এ দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে' পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ দেশের শাসকমহল কিন্তু খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০০০ (HIES 2000) এর মাধ্যমে ২০০০ সালেই বিপৎসংকেত পাওয়ার কথা, যে জরিপে প্রথম সরকারিভাবে জিনি (বা গিনি) সহগ হিসাব করা শুরু হয়েছিল! অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাপ করার জন্য নানা পরিমাপক

ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে লরেঞ্জ কার্ভ এবং গিনি সহগ অন্যতম। কোনো অর্থনীতির গিনি সহগ যখন দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ০.৫ এর কাছাকাছি পৌঁছে যায় বা ০.৫ অতিক্রম করে তখন নীতি-নির্ধারকদের বোঝার কথা যে আয়বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নিচে উপস্থাপিত সারণি-৩ মোতাবেক ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের গিনি সহগ ছিল মাত্র ০.৩৬, মানে প্রচণ্ড দারিদ্র্যকবলিত দেশ হলেও ঐ পর্যায়ে এ দেশে আয়বৈষম্য তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল। ১৯৮৩-৪ অর্থ-বছর পর্যন্ত জিনি সহগ ০.৩৬ ছিল। এরপর আশির দশক ও নব্বই দশকে জিনি সহগ বেড়ে ২০০০ সালে তা ০.৪৫ এ পৌঁছে যায়। ২০০৫ সালে জিনি সহগ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ০.৪৬৭। ২০১০ সালেও জিনি সহগ ০.৪৬৫ এ রয়ে গেছে, তেমন কমানো যায়নি। ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ মোতাবেক জিনি সহগ আবার বেড়ে ০.৪৮৩ এ পৌঁছে গেছে। সারণি-৪ এ আরেকটি পরিমাপকের গতি-প্রকৃতির মাধ্যমে ২০১০ ও ২০১৬ সালের মধ্যে আয়বৈষম্য বিপজ্জনকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিপক্ষে এবং ৫-১০ শতাংশ ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ফুটে উঠেছে: ২০১০ সালে দরিদ্রতম ৫ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির ০.৭৮ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে মাত্র ০.২৩ শতাংশে নেমে গেছে। ২০১০ সালে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ জনসংখ্যার মোট আয় ছিল মোট জিডিপির ২ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা মাত্র ১.০১ শতাংশে নেমে গেছে। সমস্যার আরেক পিঠে দেখা যাচ্ছে, দেশের ধনাঢ্য ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠির দখলে ২০১০ সালে ছিল মোট জিডিপির ৩৫.৮৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৩৮.১৬ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আরও দুঃখজনক হলো, জনগণের সবচেয়ে ধনাঢ্য ৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দখলে ২০১৬ সালে চলে গেছে মোট জিডিপির ২৭.৮৯ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ছিল ২৪.৬১ শতাংশ।

এই ধনাঢ্য সৃষ্টিকারী ও ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর দখলে জিডিপির ক্রমবর্ধমান অংশ পুঞ্জীভূত হতে দেওয়ার বিপদ সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর কৌশল কী ফল প্রসব করতে পারে, তা আরও নাটকীয়ভাবে ধরা পড়েছে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হেডলাইন সংবাদ 'বিশ্বে ধনকুবেরের সংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের শীর্ষে বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে। ঐ খবরে জানানো হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্স'-এর প্রতিবেদন *ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮* মোতাবেক ২০১২ সাল থেকে ২০১৭ এই পাঁচ বছরে অতি ধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থানটি দখল করেছে বাংলাদেশ। ঐ পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭.৩ শতাংশ হারে। ঐ গবেষণা প্রতিবেদনে ৩০ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ডলারের (প্রায় ২৫২ কোটি টাকা) বেশি নিট-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের 'আল্ট্রা-হাই নেটওয়ার্থ' (ইউএইচএনডাব্লিউ) ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে, বিশ্বে মোট ২৫৫,৮৫৫ জন ইউএইচএনডব্লিউ ইন্ডিভিজুয়ালের সবচেয়ে বেশি ৭৯,৫৯৫ জন রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জাপান, তাদের ধনকুবেরের সংখ্যা ১৭,৯১৫ জন। তৃতীয় থেকে দশম স্থানগুলোয় রয়েছে গণচীন (১৬,৮৭৫ জন), জার্মানী (১৫,০৮০ জন), কানাডা (১০,৮৪০ জন), ফ্রান্স (১০,১২০ জন), হংকং (১০,০১০ জন), যুক্তরাজ্য (৯,৩৭০ জন), সুইজারল্যান্ড (৬,৪০০ জন) ও ইতালি (৫,৯৬০ জন)। এই ২৫৫,৮৫৫ জন ধনকুবেরের সংখ্যাবৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ১২.৯ শতাংশ, কিন্তু তাদের সম্পদবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৩ শতাংশ। তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ ট্রিলিয়ন (মানে সাড়ে ৩১ লক্ষ কোটি) ডলারে। গত পাঁচ বছরে ধনকুবেরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে গণচীনে ও হংকং-এ, কিন্তু ধনকুবেরের সংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ১৭.৩ শতাংশ বাংলাদেশে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৭ সালে ধনকুবেরের সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন। গণচীনে ধনকুবেরের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৪ শতাংশ।

সারণি-৩: বাংলাদেশের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের ক্রমাগত বৃদ্ধি: ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল

সাল	জিনি সহগ
১৯৭৩-৭৪	০.৩৬
১৯৮৩-৮৪	০.৩৬
১৯৮৮-৮৯	০.৩৮
১৯৯১-৯২	০.৩৯
১৯৯৫-৯৬	০.৩৯
১৯৯৫-৯৬	০.৪৩
২০০০	০.৪৫
২০০৫	০.৪৬৭
২০১০	০.৪৬৫
২০১৬	০.৪৮৩

সূত্র: রিজওয়ানুল ইসলাম, ২০১৪, "অমানবিক অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি," *দৈনিক বণিক বার্তা*, বিশেষ সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৯ জুন ২০১৪, পৃ. ৮ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১৪.০২, পৃ. ৫৩১।

সারণি-৪: বিভিন্ন গ্রুপের খানার ভাগে মোট জিডিপির শতাংশ:
খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ ও ২০১৬ মোতাবেক

আয়ের ভিত্তিতে খানাসমূহের গ্রুপ	খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ মোতাবেক জিডিপির শতাংশ	খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ মোতাবেক জিডিপির শতাংশ
সর্বনিম্ন ৫% জিডিপি অর্জনকারী খানা	০.৭৮	০.২৩
সর্বনিম্ন ১০% জিডিপি অর্জনকারী খানা	২.০০	১.০১
সর্বোচ্চ ১০% জিডিপি অর্জনকারী খানা	৩৫.৮৫	৩৮.১৬
সর্বোচ্চ ৫% জিডিপি অর্জনকারী খানা	২৪.৬১	২৭.৮৯

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮: *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018*, ঢাকা, বাংলাদেশ, সারণি ১৪.২০, পৃ. ৫৩১।

অর্থনীতিবিদদের কাছে আয়বৈষম্য দেখানোর জন্যে আরেকটি পরিমাপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেটাকে বলা হয় পা'মা অনুপাত (Palma Ratio) বা পালমা অনুপাত। একটি দেশের সর্বোচ্চ আয়ের মালিক দশ শতাংশ জনগণের মোট আয় সর্বনিম্ন আয়ের মালিক চল্লিশ শতাংশ জনগণের মোট আয়ের কতগুণ বেশি সেই অনুপাতকেই পা'মা বা পালমা অনুপাত বলা হয়। কোনো দেশের পা'মা অনুপাত ১ অতিক্রম করলে এবং ক্রমবর্ধমান হলে দেশটি মধ্য আয়বৈষম্যের দেশে পরিণত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়, পা'মা অনুপাত ৩ এর কাছাকাছি গেলে দেশটি উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। অতএব, পা'মা অনুপাত ক্রমাগত বাড়তে থাকলে উন্নয়ন তত্ত্বের বৈষম্যবিরোধী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষম্য নিরসনকারী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ঐ দেশে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারে ১৯৮০ এর দশক থেকে ক্রমাগতভাবে ১৯৯০ এর দশক ও ২০০০-২০১০ এর দশকে বাংলাদেশের আয়বৈষম্য পরিমাপের পা'মা অনুপাতটি হিসেব করে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে পা'মা অনুপাত ছিল ১.৬৬, ১৯৯০ এর দশকে ঐ অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ২.০৮ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং

২০০০-২০১০ এর দশকে সেটা আরও বেড়ে ২.৫৬ হয়ে গেছে। আরও মারাত্মক হলো, ২০১৬ সালের হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES 2016) মোতাবেক বাংলাদেশের পা'মা অনুপাত নির্ণীত হয়েছে ২.৯৩, যার ফলে বলা যায় বাংলাদেশ এখন 'বিপজ্জনক আয়বৈষম্য' এর স্তরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

২. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধির ধারা

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের আগেই সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর শর্তের চাপে এ দেশে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মার্কিনপন্থী খোন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের সরকার পাকিস্তানী স্টাইলে স্বজনতোষী পটুজিবাদ (ক্রোনি ক্যাপিটালিজম) প্রতিষ্ঠাকে আবার এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে এনেছিল। ঐ সময়ের সরকারি নীতিগুলোতে রাষ্ট্রের এই মতাদর্শিক দিক পরিবর্তনের অজস্র প্রমাণ রয়েছে। জিয়াউর রহমান সরকারের ১৯৭৮ সালের বিনিয়োগ নীতিমালা এব্যাপারে একটা মাইলস্টোন, যেখানে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য অনেকগুলো নীতি ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৮২ সালে এরশাদ সরকার প্রবর্তিত 'নয়া শিল্প নীতি' এবং ১৯৮৬ সালে প্রবর্তিত 'সংশোধিত শিল্প নীতি' ও আমদানি উদারীকরণ নীতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের প্রয়াস। আশির দশকে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আই এম এফ ও বিশ্ব ব্যাংকের 'কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি' 'নিউ লিবারেল' নীতিমালা সংস্কারের ধারাবাহিকতাকে জোরদার করার জন্যই পরিচালিত হয়েছিল। আমদানি উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীকরণ, ব্যক্তিখাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকার সংকোচন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ তাদের প্রেসক্রিপশনগুলোর মূল ফোকাস ছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এ দেশে 'নিউ লিবারেল' অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি আরও তরান্বিত হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আমদানি উদারীকরণের রাশ টেনে ধরার প্রয়াস নিলেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাধানিষেধের কারণে তারা তেমন সফল হয়নি। অন্যদিকে, ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার পালাক্রমে এ দেশে গত ২৮ বছরের মধ্যে ২৬ বছর সরকারে আসীন থাকলেও দেশে আয়বৈষম্য নিরসনে তাদের তেমন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০১০ সালের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সংবিধানে সমাজতন্ত্র ফেরত এসেছে। কিন্তু, নামকাওয়াস্তে সমাজতন্ত্রকে সংবিধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট এব্যাপারে নীরবতা পালনকেই নিরাপদ মনে করছে। এর দুটো কারণ আন্দাজ করা যায়: প্রথমত, আওয়ামী লীগ নব্বই দশকের শুরুতেই "মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকে তাদের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র এখন আর রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় নয়।

১৯৭০ সালের পাকিস্তানে ২২টি কোটিপতি পরিবারের কথা বলা হতো, যারা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ঐ ২২ পরিবারের মধ্যে দুটো পরিবার ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, তা-ও একটি ছিল অবাঙালি। ঐ বাংলাদেশেই ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মোতাবেক ২৩,২১২ জন কোটিপতি ছিল। ২০১৪ সালে তারা ঐ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করেছে বলে দাবি করেছে। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে ঐ সংখ্যা ৫৪,৭২৭ বলে বাংলাদেশ

ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে অর্থমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন, দেশে এক কোটি টাকার বেশি আমানতের ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে ১ লাখ ১৪ হাজারেরও বেশি। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির কাছে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে যাওয়ার বিপদ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে সে ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের কি কোনো করণীয় নেই? সারণি-৩ এ দেখানো হয়েছে, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল মাত্র ০.৩৬, মানে প্রচণ্ড দারিদ্র্য-কবলিত দেশ হলেও ঐ পর্যায়ে এ দেশে আয় বৈষম্য তুলনামূলকভাবে সহনীয় ছিল। ২০১৬ সালের হাউসহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভেতে জিনি সহগ বেড়ে ০.৪৮৩ এ পৌঁছে গেছে। সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য যেসব বিষয় এই বিপদটার জানান দিচ্ছে সেগুলো হলো: ১) দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মাতাপিতার বিত্তের নিক্তিতে সন্তানের স্কুলের এবং শিক্ষার মানে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; ২) দেশে চার ধরনের মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে; ৩) ব্যাংকের ঋণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে এবং ঋণখেলাপি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে; ৪) দেশের জায়গা-জমি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট, ফ্ল্যাট অর্থাৎ রিয়াল এস্টেটের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে; ৫) বিদেশে পুঁজি পাচার মারাত্মকভাবে বাড়ছে; ৬) ঢাকা নগরীতে জনসংখ্যা এক কোটি পঁচাত্তর লাখে পৌঁছে গেছে, যেখানে আবার ৪০ শতাংশ বা ৭০ লাখ মানুষ বস্তিবাসী; ৭) দেশে গাড়ি, বিশেষত বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; ৯) বিদেশে বাড়িঘর, ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক পড়েছে; ১০) ধনাঢ্য পরিবারগুলোর বিদেশ ভ্রমণ বাড়ছে; ১১) উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবাহ বাড়ছে; ১২) উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ঘন ঘন বিদেশে যাওয়ার খাসলত বাড়ছে; ১৩) প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিলাসবহুল ক্লিনিক দ্রুত বাড়ছে; ১৪) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে; ১৫) দেশে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল, পাবলিক স্কুল এবং ও লেভেল/এ লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মচ্ছব চলছে; ১৬) প্রধানত প্রাইভেট কারের কারণে সৃষ্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রাফিক জ্যাম নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে; এবং ১৭) দেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বেড়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে পদে পদে। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সিংহভাগ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্যের রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশের জাতীয় সমাজবিন্যাসকে (national social formation) সামীর আমিন বর্ণিত প্রান্তীয় পুঁজিবাদী সমাজ ফর্মেশন আখ্যায়িত করা যায়, যেখানে একটি ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে বিপুল জনগণের আবাসস্থল গ্রামীণ সমাজে প্রাক-পুঁজিবাদী কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরুর পর্বে দেশের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি-নির্ভর, যেখানে কিষাণ উৎপাদন পদ্ধতি (peasant mode of production) ছিল প্রাধান্য-বিস্তারকারী উৎপাদন পদ্ধতি। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভূমিব্যবস্থায় আরোপিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারব্যবস্থা ১৯৫০ সালের ইস্ট বেঙ্গল স্টেট একুজেশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট (EBSATA) এর মাধ্যমে নামকাওয়াস্তে বিলুপ্ত হলেও ভূমি মালিকানা ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় জোতদার ও বৃহৎ ভূমি মালিক গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের কৃষি থেকে উৎখাত করা যায়নি, কিন্তু তবুও মানতে হবে যে মাঝারী ও ক্ষুদ্র ভূমি মালিক-কৃষক এবং প্রান্তিক জোতসমূহের মালিক ও ভাগচাষীরাই এ দেশের গ্রামীণ কিষাণ সমাজগুলোর প্রধান উৎপাদক গোষ্ঠী হিসেবে জীবনযাপন করতেন। (স্বাধীন

বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত কোনো সত্যিকার ভূমি সংস্কার নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়নি।) দেশের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত নগরের অধিবাসী, বাকি ৯৩ শতাংশ মানুষ দেশের ছিয়াশি হাজারেরও বেশি গ্রামগুলোর বাসিন্দা। ঐ গ্রামগুলোকে তখন অনায়াসে শানিন-কথিত কিষাণ সমাজ (peasant society) আখ্যায়িত করা যেতো, যেখানে পরিবারকেন্দ্রিক আত্মপোষণমূলক কৃষি উৎপাদনব্যবস্থা, পারিবারিক শ্রমের ওপর প্রায় সর্বাত্মক নির্ভরশীলতা, কিষাণ পরিবারের আত্মশোষণ (self-exploitation), কৃষিজাতদ্রব্য ও কৃষি-উপকরণেরসীমিত বাজারীকরণ, খাদ্যশস্যকেন্দ্রিক কৃষি উৎপাদন ও সীমিত সংখ্যক বাজারমুখী ফসল উৎপাদন, গ্রামীণ সমাজে কৃষির পাশাপাশি কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রচলন, গ্রামীণ হাট-বাজারগুলোতে খুদে বণিকদের বাণিজ্য, মহাজনী ঋণপ্রথা, কৃষিজাতদ্রব্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, হাজার হাজার বছরব্যাপী গেড়ে বসে থাকা সনাতন চাষ পদ্ধতি, পরিবারভিত্তিক হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-মহিষ-মাছ-তরিতরকারি চাষ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহকে সহজেই চিহ্নিত করা যেতো। জাতিসংঘ কর্তৃক তখনকার প্রচলিত ২১২২ দৈনিক কিলো-ক্যালরি তাপ-উৎপাদনকারী খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে বিন্যস্ত দারিদ্র্য সীমার বিচারে বিংশ শতাব্দীর পুরো সত্তর দশকে বাংলাদেশের জনগণের ৮২ শতাংশের অবস্থান ছিল দারিদ্র্য সীমার নিচে, শহরের ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী তখনো জনগণের দুই-তিন শতাংশও হতো কিনা সন্দেহ রয়েছে। গ্রামের বৃহৎ ভূমি মালিক কিংবা মাঝারী ভূমি-মালিক-কৃষক পরিবারগুলোকে বড়জোর মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো অন্তর্ভুক্ত করা যেতো। বাংলাদেশের ৮২ শতাংশ মানুষ ঐ পর্যায়ে স্রেফ দারিদ্র্যপীড়িত জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে পর্যুদস্ত নিম্নআয়ের মানবগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এটাই জাতিসংঘের পরিমাপ সাক্ষ্য দিচ্ছে। সারণি-৩ এর তথ্য বলছে, ১৯৭৩-৪ সালে বাংলাদেশের জিনি সহগ ছিল ০.৩৬। এর মানে হলো, সিংহভাগ জনগণ তখন চরম দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হলেও জনগণের মধ্যে আয়বৈষম্য তখনো গুরুতর সমস্যার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি।

পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তানকে যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' হিসেবে পুঁজি-লুণ্ঠন ও পুঁজি পাচারের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধির ন্যায্য-হিস্যা দূরে থাক এমনকি ১০ শতাংশও পূর্ব-পাকিস্তানীদের কপালে জোটেনি। পাকিস্তানের নব্য-ঔপনিবেশিক, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজি লন্ঠনমূলক (extractive) রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধনাঢ্য ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানে ধন-সম্পদ আহরণের সুযোগ পেয়েছিল তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অতি ক্ষুদ্র একটি মহল শাসকমহলের কৃপাধন্য হয়ে কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার পেলেও তাদের অনুপাত পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশও হবে না, এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়। এই নিদারুণ বঞ্চনা থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের পথ বেয়ে জাতিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে, যেজন্যে আমরা বলি শোষিত-বঞ্চিত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা।

১৯৭২-৭৫ পর্বের বাংলাদেশ ছিল ১ কোটি ভারত-প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থী এবং আরও দুই কোটি অভ্যন্তরীণ-বাস্তুচ্যুত জনগণের পুনর্বাসন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্নির্মাণ, প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্যঘাটতি পূরণ এবং চরম বস্ত্রাভাব পূরণ চেষ্টায় রত সংকটজর্জরিত একটি চরম অভাবগ্রস্ত জনপদ। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বন্ধুভাবাপন্ন পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোসহ কিছু দেশ

ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ঐ সময় তাদের যথাসাধ্য সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ালেও নব্য-স্বাধীন দেশটি বিশ্বের করুণানির্ভর 'তলাবিহীন ভিক্ষার ঝুড়ি'র অবস্থান থেকে মুক্তি পাবে কি না সেটা বোঝা যাচ্ছিল না, যদিও এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যাভাবে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে এ দেশে কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয় খাতে জাতীয় সম্পদের যে বিপুল সমাবেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা লুটপাট ও ছারখার করতে শুরু করেছিল দুর্নীতিবাজ ও লুটেরারা। একইসাথে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পুঁজি লুণ্ঠনের বখরা-ব্যবস্থা গড়ে তুলল ব্রিফকেসধারী নব্য-ব্যবসায়ীরা এবং তাদের সাথে বখরা-সমঝোতায় আবদ্ধ ব্যাংকাররা। ১৯৭৩ সাল থেকে বেধড়ক দুর্নীতি ও লুটপাট, অদক্ষতা, অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক রাজনীতি এবং অপ্রয়োজনীয় শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভারে লোকসানের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতে শুরু করল প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান। এগুলোকে ভাসিয়ে রাখতে গিয়ে সংকটে পড়ল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। বৈদেশিক অনুদান ও রিলিফ লোপাট থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও লুটপাট আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় দ্রুত ধস নামিয়ে দিল। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুই আফসোস করেছিলেন,'আমি সারা দুনিয়া থেকে বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য ভিক্ষা করে আনি, আর তা সাবাড় করে দেয় চাটার দল'। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসানের পেছনেও চাটার দল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ে একশ্রেণির ব্রিফকেসধারী ঋণ-শিকারী ও ব্যাংক-কর্মকর্তার মচ্ছবের পেছনেও চাটার দল। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা টিসিবি এবং সেবা সংস্থা রেডক্রসও পরিণত হলো লুটপাটের প্রতীকে। এভাবে দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমলা-যোগসাজশে যখন দুর্নীতিবাজ ও পুঁজি-লুটেরারা পুঁজিপতি বনে গেল তখন প্রাইভেট সেক্টরে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হলো আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই। পুঁজিবাদের বিশ্বমোড়ল মার্কিনিদের সাথে দহরম-মহরম গড়ে উঠল এসব নব্য-পুঁজিপতির। সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার দায়ভার চাপানো হলো সমাজতন্ত্রের নামে গৃহীত নীতিগুলোর ওপর। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা পুঁজিবাদী লবি দিন দিন জেঁকে বসতে শুরু করল বঙ্গবন্ধুর চারপাশে। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অসম্মানজনকভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো, আর খন্দকার মোশতাক হয়ে উঠল বঙ্গবন্ধুর আপনজন। দেশের শিল্পনীতিতে ক্রমশ ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থাদি গৃহীত হলো। কিন্তু, দেশের অর্থনৈতিক সংকট ও জনগণের দুর্দশা বেড়েই চলেছিল। ১৯৭৪ সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পর বঙ্গবন্ধু হয়তো তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৭৫ সালে প্রণীত তাঁর বাকশাল কর্মসূচি নিছক একদলীয় স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে পরবর্তী সময়ে বদনামের ভাগীদার হলেও ঐ কর্মসূচির মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপাদান যে নিহিত ছিল, তা তাঁর চরম শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিলেন; আওয়ামী লীগ পরিণত হয়েছিল দুর্নীতি, দুঃশাসন ও নিপীড়নের জন্য জনপ্রিয়তা হারানো শাসকদলে। তাঁরই ছত্রছায়ায় দুধকলা দিয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের পুষছিলেন বঙ্গবন্ধু। অতএব, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়নি তাঁর হন্তারক শক্তি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির নায়ক বনে গেলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক। যবনিকাপাত হলো অর্থনৈতিক মুক্তির পথ অন্বেষার।

যে সত্যটি উদ্‌ঘাটনের জন্যে উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি প্রদত্ত হলো তা হলো, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির বাস্তবতার পাশাপাশি এ দেশের দুর্নীতিবাজ ও পুঁজি-লুটেরা গোষ্ঠীগুলোর বিকাশ শুরু হলেও ১৯৭৫-৯০ পর্বের সামরিক শাসনামলেই জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যা গেড়ে বসেছে। সারণি-৩ সাক্ষ্য দিচ্ছে, ১৯৭৩-৪ অর্থবছর আয়বৈষম্য

পরিমাপক যে জিনি সহগ ০.৩৬ ছিল ১৯৮৩-৪ অর্থবছরেও তা ছিল ০.৩৬। সে জন্যেই বলা প্রয়োজন, রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে বিষয়টি প্রাথমিক গুরুত্বের দাবিদার তা হলো ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও পুঁজি পাচার পর্ব থেকে মুক্তি লাভের পর মাত্র তিন বছর আট মাসের মাথায় আবার বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পুরানো পাকিস্তানী শাসন, শোষণ ও পুঁজি-লুণ্ঠন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পথ ধরে বাংলাদেশে আবারো প্রতিষ্ঠিত হলো পুরানো পাকিস্তানি কায়দার সামরিক বাহিনী ও সিভিল আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত নব্য-ঔপনিবেশিক, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিলুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব মোড়লরা খোলাখুলি নেমে পড়ল এ দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির মোড় পরিবর্তনের খেলায়। বৈদেশিক সাহায্যের বান ডাকল। জিয়াউর রহমান প্রকাশ্যেই বলতেন, 'Money is no problem'। সমন্বয়ের রাজনীতির ধুয়া তুলে স্বাধীনতাবিরোধী মহলগুলোকে আবারো এ দেশে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিলেন তিনি। সুযোগ-শিকারী ডানপন্থী ও বামপন্থী নেতা-পাতিনেতা-কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও সিভিল আমলা, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ীদেরকে কেনাবেচার রাজনীতির মাধ্যমে অথবা নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জড়ো করে ক্যান্টনমেন্টে বসেই তিনি গড়ে তুললেন তাঁর তল্পিবাহক রাজনৈতিক দল বিএনপি। রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তিনি নিজে দুর্নীতি না করলেও জিয়াউর রহমানের আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও পুঁজিলুণ্ঠন ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছিল। এ-ব্যাপারে কোসানেকের কাছে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমান সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি অপরিহার্য বাস্তবতা (fact of life)। কোসানেক বলছেন জিয়া আমলে, "Corruption was converted from a crime to a habit (Kochanek, 1993, p. 259)." মার্কাস ফ্রান্ডার মতামত এ-ব্যাপারে আরও খোলামেলা," "What Zia has done is to regularize corruption and make it almost necessary for everyone to become involved in it (Franda, 1982, p. 281)." আমার প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment* এ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় পরিবর্তন প্রসঙ্গে আমি নিচের বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছি:

Zia drastically changed the policy regime of the Bangladesh economy by re-introducing the Pakistani-style policies of patronising the private sector. He also doled out import permits, bank loans, foreign currency allocations, industrial licenses, industrial plots, residential plots and lucrative government contracts to individuals recruited in BNP. Analysts have termed the policy of nurturing the capitalists of the private sector in Bangladesh during the Zia regime as 'state-sponsored capitalism'... The inflow of foreign loans and grants greatly increased during Zia's rule. 'Money is no problem' was his favourite utterance. The increased flow of foreign aid created a group of beneficiaries who made fortunes from the flourishing aid businesses of the period. This group of principal beneficiaries includes indenters, construction contractors, importers, clearing and forwarding agents, suppliers, consultant engineers and economists, bankers, executives of insurance companies, NGO functionaries, lawyers, travel agents,

shipping agents, bureaucrats, ministers, members of parliament (MPs) and the leaders of BNP with easy access to Zia. It implies that a class of comprador bourgeoisie and lumpen bourgeoisie (or pseudo-capitalists) emerged very rapidly during the Zia era (Islam, 2019, Pp. 262-3).

প্রফেসর রেহমান সোবহান ব্যাংকঋণের মোড় পরিবর্তন সম্পর্কে নিচের উদ্বৃতিটি ব্যবহার করেছেন,

This trend in promoting the private sector has acquired a special urgency after the change of regime in 1975. Prior to that only Tk. 120 million or 4% of the total had been sanctioned as loans to the private sector. After 1975 the pattern was completely reversed, so that of a much larger sanction of Tk.9,124 million between 1975/81, 96% now went to the private sector. The policy after 1975 to channel the overwhelming bulk of public credits to the private sector was consistent with the change in the direction of state policy from one of containing the growth of a capitalist class to one of building up such a class (Sobhan, 1982, p. 49).

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া (comprador bourgeoisie) ও মুৎসুদ্দি সরকার (comprador government) ধারণাগুলো ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত পল বারানের বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ *Political Economy of Growth* এ সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি মুৎসুদ্দি পুঁজি বা প্রচলিত অর্থে দালাল পুঁজি কনসেপ্টটির সংজ্ঞা দিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর নব্য-ঔপনিবেশিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলোর প্রচণ্ড শক্তিধর বহুজাতিক করপোরেশানগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে তৃতীয় বিশ্বের পুঁজিপতিদের ছোট তরফ বা এজেন্টের ভূমিকা পালনের বিষয়টিকে ফোকাস করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইন্ডেন্টর, আমদানিকারক, সোল এজেন্ট, পরিবেশক, অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট স্থাপনকারী শিল্পপতি, ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা সেলস এজেন্টের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যেসব বাণিজ্যনির্ভর পুঁজিপতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মুনাফা আহরণে ব্যাপৃত থাকে, তাদেরই পল বারান মুৎসুদ্দি বা দালাল পুঁজির এই সংজ্ঞার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই নতুন কনসেপ্টটির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল উপনিবেশ-উত্তর বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নব্য-সাম্রাজ্যবাদী মেট্রোপলিটান ক্যাপিটালিস্ট সেন্টারস বা পুঁজিবাদী মূল কেন্দ্রগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকারী রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে বিকাশমান পুঁজিপতিদের সম্পর্ক এবং তাদের চরিত্রগত পার্থক্য উভয়ই ব্যাখ্যা করার তাগিদে। আর, আধিপত্য-পরনির্ভরতা সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নব্য-ঔপনিবেশিক বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রের সরকারকে তিনি 'মুৎসুদ্দি সরকার' অভিহিত করেছেন। সামরিক একনায়ক জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সরকারের শাসনামলে তাঁদের দুজনেরই মার্কিন বশংবদতার কারণে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈদেশিক সহায়তার ওপর সর্বব্যাপ্ত নির্ভরতাহেতু তাত্ত্বিকভাবে তাঁদের নেতৃত্বাধীন সরকারকে মুৎসুদ্দি সরকার আখ্যায়িত করলে ভুল হবে না। ১৯৭৫ সাল থেকে গত ৪৪ বছর ধরে বাংলাদেশে যে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিকাশ হয়েছে তাদের চরিত্র বর্ণনার জন্যে মুৎসুদ্দি পুঁজি কনসেপ্টটিও খুবই জুৎসই হবে। ১৯৭৫ সাল থেকে বর্ধিত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ থেকে মার্জিন আহরণ এবং আমদানি বাণিজ্যে বহুল প্রচলিত নানা পদ্ধতিতে এ দেশে পুঁজি লুণ্ঠন ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করতে শুরু করেছিল, যে প্রক্রিয়াগুলো স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। ১৯৯১ সালে ভোটের রাজনীতি চালু হওয়ার পর গত ২৮ বছর একই প্রক্রিয়াগুলো

হুবহু চালু রয়েছে। তাই, এ দেশের কয়েক লাখ ব্যবসানির্ভর পুঁজিপতি, মার্জিন-আত্মসাৎকারী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, দুর্নীতিবাজ আমলা, সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদার এবং বৈদেশিক সহায়তার পাইপলাইনের ঘাটে ঘাটে সুবিধাভোগীরাই যে গত ৪৪ বছরে নব্য-ঔপনিবেশিক, প্রান্তীয় পুঁজিবাদী, আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিলুণ্ঠনমূলক চরিত্রের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ধনাঢ্য ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন—তাতে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। ২০১৯ সালে আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে গেছে, মানে ৩০২ বিলিয়ন ডলার জিডিপির তুলনায় রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের যোগফল প্রায় ১০২ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের কয়েক লাখ ধনাঢ্য ব্যক্তি ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৯৫ শতাংশই হয়তো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যখাতে ব্যবসায়ী হিসেবে ধনার্জনে ব্যাপৃত রয়েছেন। অতএব, তাদের সিংহভাগই যে প্রকৃত বিচারে মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু, প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুপাত জনগণের ১ শতাংশও হবে কি-না সন্দেহ! এ দেশে শিল্পপতিদের সিংহভাগও কোনো না কোনোভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত।

সত্তরের দশকের শেষ এবং আশির দশকের শুরু থেকে এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্প দ্রুত বর্ধিষ্ণু শিল্প হিসেবে বিকশিত হতে শুরু করেছে এবং গত চার দশকে এই শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারীশ্রমিক। এই নারীশ্রমিকেরা পোশাক শিল্পে কর্মরত থাকায় তাদের পরিবার বেকারত্ব ও চরম দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতি পেলেও এই পরিবারগুলো এখনো নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। অন্যদিকে, তৈরি পোশাক শিল্পে যারা উদ্যোক্তা শিল্পপতি হিসেবে সাফল্যের সাথে বিনিয়োগ করেছেন তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এখন দেশের ধনাঢ্য ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। তাঁরা এখন আরও অনেক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে বিনিয়োগ করে দ্রুত দেশের ধনকুবেরদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলেছেন। উপরে উল্লিখিত ওয়েল এক্স-এর জরিপে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ গার্মেন্টস মালিকরাই। দুঃখজনক হলো, দেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচারকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অধিকাংশই গার্মেন্টস মালিক। মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোমের মালিক এবং টরোন্টোর 'বেগমপাড়ার' বাড়ির মালিকদের মধ্যেও দুর্নীতিবাজ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল আমলা, সামরিক অফিসার ও রাজনীতিবিদদের পরিবারের পাশাপাশি গার্মেন্টস মালিকদের পরিবারই বেশি অনুপাতে চিহ্নিত করা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাড়ি দেওয়া নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (NRB) পরিবারের মধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের পরিবারই সংখ্যাগুরু। দেশের বাণিজ্য ও সেবা খাতেও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণশিল্প, টেলিভিশন চ্যানেল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, প্রাইভেট ব্যাংক-বীমা, প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-কিন্ডারগার্টেন, সংবাদপত্র, এনজিও, হোটেল-রেস্তোঁরা, বিলাসী পরিবহন, হসপিটাল-ক্লিনিক-ডায়াগনোস্টিক সেন্টার—এগুলো দেশের দ্রুতবর্ধনশীল মুনাফাদায়ক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র।

এটাও আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে দেশের কৃষিব্যবস্থা (agrarian system) গত ৪৪ বছরে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ, প্রান্তিকীকরণ (marginalization) এবং নিঃস্বকরণ (pauperization) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেকখানি রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলো হলো: ক) জমির মালিকানা ও কৃষি-জোতের (operational holding) ক্রমহ্রাসমান আকার, খ) জমির আকারের প্রান্তিকীকরণ ও ভূমিহীন গ্রামীণ পরিবারের অনুপাত বৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, গ) ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী, শহুরে অনুপস্থিত ভূমিমালিক পেশাজীবী ও প্রবাসী

মালিকদের কাছে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিকানার হস্তান্তর ও পুঞ্জীভবন এবং এর ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমিমালিকদের ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও খেতমজুরে পরিণত হওয়ার হার বৃদ্ধি, ঘ) বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমির মালিকানার খণ্ডিতকরণ ও প্রান্তিকীকরণ, ঙ) মাঝারি ও ছোট ভূমিমালিক-কৃষকদের সংখ্যা ও অনুপাতের দ্রুত হ্রাস এবং এর ফলে বর্গাদারি ও ভাগচাষের ব্যাপক অনুপাত বৃদ্ধি, চ) একই জোতে অন্তর্ভুক্ত জমির খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে ছড়িয়ে থাকা এবং এর ফলে চাষের প্লটের সাইজ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হওয়ার প্রবণতা, ছ) ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় বর্গাদারি ও ইজারাদারির দ্রুত প্রবৃদ্ধি, যেখানে ক্ষুদ্র ভূমিমালিক-কৃষক কর্তৃক নিজেদের মালিকানাধীন জমির সাথে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের জমি বর্গা নিয়ে চাষের জোতকে 'অর্থনৈতিক জোতে' পরিণত করার প্রবণতাই প্রধানত ক্রিয়াশীল, জ) কৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের অব্যাহত আধিপত্য, ঝ) কৃষি-উপকরণ জোগানব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণ, যেখানে ক্ষমতাশীল দল বা জোটের নেতাকর্মীদের মুনাফাবাজির তাণ্ডব এবং চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের উপদ্রব কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে, ঞ) প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা সমস্যা ও মহাজনী ঋণের অব্যাহত দাপট, ট) কৃষিতে মৌসুমী বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব সমস্যার অব্যাহত প্রাদুর্ভাব, ঠ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলহানি, ড) ব্যয়বহুল বিয়ে, যৌতুক, বিদেশে অভিবাসন-ব্যয় মেটানো এবং মারাত্মক অসুস্থতার কারণে জমি বিক্রয় ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত নেতিবাচক প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীতে কৃষিখাতে অনেকগুলো ইতিবাচক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে, যার মধ্যে উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, সেচব্যবস্থার আওতায় আসায় দেশের অধিকাংশ জমিতে বোরো চাষের সম্প্রসারণ, কৃষিখাতে যথাযথ ভর্তুকি প্রদান, কৃষিঋণ পদ্ধতির সহজীকরণ, ফসলের বহুধাকরণ, কৃষির লাগসই যান্ত্রিকীকরণ, উচ্চফলনশীল ফসল, তরিতরকারি, মাছ, হাঁস-মুরগি ও ফলমূল চাষের ব্যাপক প্রচলন, আধুনিক রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশকের সহজলভ্যতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ফলে কৃষিব্যবস্থার নেতিবাচক প্রবণতাগুলোকে ছাপিয়ে উৎপাদনশীলতার উল্লম্ফন দেশে একটি কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছে। দেশ ধান ও আলু উৎপাদনে উদ্বৃত্ত অবস্থানে পৌঁছে গেছে। তরিতরকারি, মাছ ও হাঁস-মুরগি উৎপাদনেও দেশের সাফল্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও দেশের কৃষকসমাজ তাদের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে যে নিজেদের উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছে, তা বলা যাচ্ছে না। এটাও প্রণিধানযোগ্য যে দেশের জিডিপির মাত্র ১৪ শতাংশ এখন কৃষিখাত থেকে আসছে। অবশ্য কৃষিতে এখনো দেশের ৪১ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ কর্মরত। আরও বলা প্রয়োজন, জিডিপিতে অবদান সংকুচিত হচ্ছে দেখে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বও অতখানি সংকুচিত হয়ে গেছে মনে করা হলে সেটা বড়সড় ভুল হবে।

বরং, বাংলাদেশ থেকে যে ১ কোটি ২০ লাখ অভিবাসী বিশ্বের নানা দেশে কর্মরত, তারা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রতিবছর যে ১৫ বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি অর্থ এবং অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ চ্যানেলে যে আরও ৮-১০ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন এই বিপুল বৈদেশিক মুদ্রাপ্রবাহ অর্থনীতির জন্যে সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ২৩-২৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স প্রবাহ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের যে ক্ষীণ প্রবাহ ছিল সে অভাবকে ভালোভাবে মিটিয়ে চলেছে। এই ১ কোটি ২০ লাখ অভিবাসীর শতকরা নব্বই জন যেহেতু গ্রামীণ জনপদের অভিবাসী, তাই এই বিশাল রেমিটেন্স প্রবাহের সুফলের সিংহভাগও গ্রামের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে চলেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দ্রুত নিরসনের অন্যতম বড় কারণ এই রেমিটেন্স প্রবাহ। রেমিটেন্স প্রবাহের সুফলভোগী পরিবারগুলোর বর্ধিত ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড়সড় সমৃদ্ধির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাড়িঘর পাকা হচ্ছে, অন্যান্য ধরনের বসতঘরেরও মান বৃদ্ধি

পেয়েছে, ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, পরিবারের সদস্যদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সামর্থ্য বাড়ছে, শিশুমৃত্যুর হার কমছে, সেনিটারি পায়খানার প্রচলন বাড়ছে, ঘরে ঘরে টিউবওয়েল বসে গেছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ চলে এসেছে, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ তরান্বিত হচ্ছে, গ্রামের রাস্তাঘাটেও আধুনিক পরিবহনব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, সর্বোপরি গ্রামের নারী সমাজের ক্ষমতায়নের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে, গ্রামীণ জনগণের মধ্যে প্রায় আশি লাখ থেকে এক কোটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৪-৫ কোটি জনগণ এখন নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায়। অবশ্য, এটাও অনস্বীকার্য যে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার মূল ফায়দাটা তুলে নিচ্ছে কয়েক হাজার আদমবেপারি, যাদের বেশির ভাগই আদম ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত কোটিপতির কাতারে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দ্রুত কোটিপতি হওয়ার আরেকটি ন্যক্কারজনক পন্থা হলো দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হওয়া। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আয়কর-ভ্যাট-কাস্টমসসহ সরকারি-আধা সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত-আধা স্বায়ত্তশাসিত সকল বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আদালতসমূহ, শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাস্থ্যবিভাগ ও সরকারি হাসপাতালসমূহ—এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যাবে না যেটা খানিকটা দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতিলব্ধ অনার্জিত আয় দুর্নীতিবাজদের পরিবারের সদস্যদেরকে অতিদ্রুত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। এই অর্থের একটা বড়সড় অংশ বিদেশেও পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর একটি অংশ মানি লন্ডারিং প্রক্রিয়ায় আবার দেশের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ছে। দেশে বিত্তবান হওয়ার আরেকটি লোভনীয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকঋণ লুণ্ঠন দেশে এখন ৬১টি ব্যাংক চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতিবছর কয়েক লাখ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি ঋণগ্রহীতার মাধ্যমে কয়েক বিলিয়ন ডলার লুটপাটের আয়োজন দিন-দিন গেড়ে বসছে। রাঘববোয়াল ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের ব্যাংকঋণ ফেরত না দেওয়া এখন ক্রমশ দুরারোগ্য ক্যানসারে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এই লুণ্ঠিত পুঁজির সিংহভাগও বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অতএব, দেশে আয়বৈষম্য বেড়ে যে বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেশের সরকারগুলো যেহেতু 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র পথ অনুসরণ করে গত ৪৪ বছর ধরে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'কে সোৎসাহে চালু রেখেছে তাতে আয়বৈষম্য নিরসনের কোনো তাগিদ সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে পরিদৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। আয়বৈষম্যের ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকারগুলোর দুঃখজনক অমনোযোগের আলোকেই বিষয়টির বিশ্লেষণকে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদবৈষম্য সম্পর্কে বিশ্বের উন্নয়ন-ডিসকোর্সে মহাবিপৎসংকেত ও ধারণাগত পরিবর্তন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আয়বৈষম্যের মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটা অনিবার্যতার সম্পর্ক থাকে বলে সাইমন কুজনেৎস বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন. তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ডিসকোর্সে 'ইনভার্টেড-ইউ হাইপথেসিস' কিংবা 'কুজনেৎস কার্ভ' তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল, যার মূল কথা হলো—কোনো দেশের মাথাপিছু আয় নিম্ন অবস্থান থেকে প্রাথমিকভাবে বাড়তে শুরু করলে ঐ দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্যও প্রাথমিকভাবে একটা পর্যায় পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। তবে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, মাথাপিছু আয় বেড়ে একটা লেভেলে পৌঁছার পর আয়বৈষম্য আর বাড়ে না। মানে, কুজনেৎসের তত্ত্ব মোতাবেক প্রাথমিকভাবে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং বৈষম্য বৃদ্ধির মধ্যে একটা trade-off থাকে। এই তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো, বৈষম্য হ্রাসকে একটি দেশের উন্নয়ন নীতিতে বেশি গুরুত্ব দিলে

প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বেশ কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে কুজনেৎস এই তত্ত্ব প্রদানের পর তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিপ্রণেতারা ষাটের দশকে আয়বৈষম্যকে অগ্রাধিকার প্রদানের পরিবর্তে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রতি মনোনিবেশ করায় বেশি উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। বিশেষত, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শিক প্রতিযোগিতার 'ঠান্ডাযুদ্ধ পর্বে' ঐ উন্নয়ন-কৌশল দক্ষিণপন্থী রাজনীতির অনুসারী শাসকমহলের কাছে 'holy writ'এর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু, সত্তরের দশক থেকেই 'কুজনেৎস কার্ভ তত্ত্ব' সঠিক নয় বলে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের গবেষণায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সাম্প্রতিককালে কুজনেৎসের এই তত্ত্ব মারাত্মক ভুল বলে সিংহভাগ উন্নয়ন তাত্ত্বিক এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ২০১২ সালে প্রকাশিত ফরাসী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটির সাড়াজাগানো গবেষণাগ্রন্থ *Capital in the Twenty First Century* তে কুজনেৎসের বাছাই করা বছরগুলো যথাযথ ছিল না দাবি করে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে পিকেটি এই তত্ত্বকে 'ভুয়া' প্রমাণ করে ছেড়েছেন। কিন্তু, মানবজাতির বড়সড় ক্ষতি তো এর মধ্যেই হয়ে গেছে। বিশেষত, গত চার দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ডামাডোলে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ শরিক হওয়ায় উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত নির্বিশেষে প্রায় সব দেশে আয় ও সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বেড়ে এখন বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। বিশ্বখ্যাত এনজিও অক্সফামের ২০১৭ সালের এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনাঢ্য আটজন ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ জমা হয়েছে এবং ঐ সম্পদ থেকে যে আয় অর্জিত হচ্ছে তা নিম্নতর আয়ের মালিক বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের (মানে তিন'শ ষাট কোটি জনগণের) আয়ের চাইতেও বেশি। অক্সফাম আরও দাবি করছে, বিশ্বের এক শতাংশ ধনাঢ্য জনগণের আয় বাকি নিরান্নব্বই শতাংশ জনগণের আয়ের চাইতে বেশি হয়ে গেছে। উন্নত দেশের শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টিতে আরও গুরুতর হলো, সাম্প্রতিক দুই দশক ধরে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পঞ্চাশ শতাংশ নিম্নতর আয়ের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। অথচ, ঐসব দেশের সবচেয়ে ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর আয় ও সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে উন্নয়ন সম্পর্কিত 'মৌল প্রয়োজন এপ্রোচ' (basic needs approach) এবং আশির দশক থেকে বিকশিত অমর্ত্য সেন ও মাহবুবুল হকের 'মানব উন্নয়ন অ্যাপ্রোচ' (human development approach) উন্নয়ন ডিসকোর্সে মাথাপিছু জিডিপির এক কেন্দ্রিক প্রতাপ ক্রমশ খর্ব করতে সক্ষম হয়। অমর্ত্য সেনের দুটো ধারণা 'entitlement & capabilities'আশির দশকে উন্নয়ন কনসেপ্টকে জিডিপির একাধিপত্য থেকে মুক্ত করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য—সে বিষয়টাকে উন্নয়ন চিন্তায় যথাযথ ফোকাসে নিয়ে আসে। সবশেষে, ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত অমর্ত্য সেনের 'উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা' (Development as Freedom) তত্ত্ব উন্নয়নকে আরও অনেক বিস্তৃত আঙ্গিকে নিয়ে যায়। 'স্বাধীনতাহীনতার সূত্রগুলো থেকে মুক্তিই উন্নয়ন'—এই তত্ত্বের পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা, যথা ১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), ২) অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ (economic facilities), ৩) সামাজিক সুযোগসমূহ (social opportunities), ৪) স্বচ্ছতার অঙ্গীকারসমূহ (transparency guarantees) এবং ৫) নিরাপত্তা রক্ষাকবচ (protective security) উন্নয়ন কনসেপ্টকে শুধু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতাহীনতার নানা ডাইমেনশন থেকে মানবমুক্তির প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে, কোনো দেশ উন্নয়ন নীতিতে বৈষম্য হ্রাসকে অগ্রাধিকার দিলে প্রবৃদ্ধি কমে যাবে বলে যে ভুল ধারণাকে কুজনেৎসের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটাও একটার পর একটা দেশে ভুল প্রমাণিত হয়ে চলেছে। বরং, যেসব দেশ উন্নয়ন নীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি সব ধরনের বৈষম্য হ্রাসকে গুরুত্ব দিয়েছে সেসব দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গত

চার দশক ধরে ক্রমাগতভাবে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ইসরায়েল, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলংকার উন্নয়ন-অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে বণ্টনের ন্যায্যতাকে অবহেলা করার কোনো যুক্তি নেই। উপরে উল্লিখিত সঠিক তত্ত্ব ও উন্নয়ন-অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি' ('inequality alleviating growth') বা 'বণ্টনের ন্যায্যতাসহ প্রবৃদ্ধি' ('equitable growth') অর্জনের কনসেপ্ট ও উন্নয়ন-কৌশল। 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি' বা 'বণ্টনের ন্যায্যতাসহ প্রবৃদ্ধি' অর্জনের কৌশলের মূল দর্শন হলো: তু সমাজব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অবশ্যম্ভাবীভাবে অন্যান্য ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করার জন্যে প্রধানত দায়ী, এবং সমাজ এবং অর্থনীতিতে বাজার ও ব্যক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাপট যতই বাড়তে থাকবে ততই আয়বৈষম্য, সম্পদ বৈষম্য, শিক্ষায় বৈষম্য, স্বাস্থ্যসেবার বৈষম্য এবং গণদ্রব্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতার বৈষম্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াগুলোও শক্তিশালী হতে থাকবে। অতএব, বৈষম্য বৃদ্ধির শক্তিগুলোকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করার জন্যে রাষ্ট্রকে জনগণের স্বার্থের পাহারাদারের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে হবে।

এই পরিবর্তিত উন্নয়ন ডিসকোর্সের ফলশ্রুতিতেই ২০১৫-৩০—এই পনের বছরের জন্যে ঘোষিত জাতিসংঘের ১৭টি 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে' (sustainable development goals—SDGs) এবং ১৬৮টি লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেটে উন্নয়নকে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর' চাইতে অনেক বিস্তৃত পরিসরে বিবেচনার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই সতেরটি লক্ষ্যেরদশম লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে 'reduce inequality within and among countries' (দেশের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশের বৈষম্য নিরসন কর)। এই লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনেকগুলো টার্গেট এবং প্রতিটি টার্গেটে এক বা একাধিক নির্দেশক (indicator)। ২০১৯ সালে এই লক্ষ্যটিকে আরও গভীর সমীক্ষার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করার অঙ্গীকারও লিপিবদ্ধ হয়েছে জাতিসংঘের ২০১৫ সালের এসডিজি ঘোষণায়। এর আগে সুইজারল্যান্ডের দ্যাভোসে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক প্রতিবেদন 'আউটলুক অন দ্য গ্লোবাল এজেন্ডা ২০১৫'-এ বিশ্বের ১ নম্বর অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য। বিলম্বে হলেও ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সম্পর্কে জাতিসংঘ এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এই উপলব্ধি খুবই গুরুত্ববহ। কারণ, বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি'র ছদ্মনামধারী পুঁজিবাদের যে চরম দক্ষিণপন্থী ভার্সনের ডামাডোলে বিশ্ব মেতে রয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলই হলো ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য। এর অন্যথা হওয়ার কোনো উপায় নেই। বাজার ব্যবস্থাকে অর্থনীতির তাবৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল সিগন্যালদাতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তিখাত বা প্রাইভেট সেক্টরকে অর্থনীতির অনিয়ন্ত্রিত চালিকাশক্তির আসনে বসিয়ে দিলে এরকম ফলাফল আসতে বাধ্য, এটা উচ্চতর অর্থনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত তু ছাত্রছাত্রীরই উপলব্ধি করার কথা। শুধু পুঁজিবাদের জ্ঞানপাপী স্তাবকেরাই সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করবে। প্রাথমিকভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামষ্টিক চাহিদা ব্যবস্থাপনায় সরকারি ভূমিকার অকার্যকারিতা ব্যাখ্যা করার জন্য এই 'নিউ লিবারেল স্কুলের' তাত্ত্বিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছিল সত্তর দশকে। 'রাষ্ট্র ব্যর্থতা' (স্টেট ফেইল্যুর) এবং 'শাসন ব্যর্থতা'কে (গভর্নেন্স ফেইল্যুর) বিশ্লেষণের মূল ফোকাসে নিয়ে এসে এই 'নিউ লিবারেল' তাত্ত্বিকরা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকোচনের মতাদর্শিক রাজনীতিকে উৎসাহিত করার অবস্থান গ্রহণ করে। ঐ সময়ে এই তত্ত্বগুলোকে অভিহিত করা হতো 'সাপ্লাই সাইড ইকোনমিকস'। ব্রিটেনে মার্গারেট থেচার ১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে তাঁর দেশে একের পর এক বাজারমুখী সংস্কারগুলো প্রবর্তন করতে শুরু করেন।

একইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির যুগল সংকট (স্ট্যাগফ্লেশন) মোকাবিলায় সরকারি নীতির ব্যর্থতাকে টার্গেট করে নিউ লিবারেল অর্থনীতিবিদরা তাঁদের সমর্থিত রাজনীতির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়াতে সক্ষম হয়। ঐ প্রেক্ষাপটেই সারা বিশ্বে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৭৯ সালে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল, যাকে খ্যাতনামা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ উইলিয়ামসন ১৯৮৯ সালে 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৮০ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাল্ড রিগানের প্রচারণার মূল বক্তব্যই ছিল 'Get the government off the back of the people'। রিগান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক তাদের মূল মিশনে পরিণত করে। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার নামে রাষ্ট্রতন্ত্র (স্টেটিজম) প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রগুলো যখন বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে একের পর এক বিলুপ্ত হয়ে গেল তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন বিশ্বে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল বলা চলে।

কিন্তু, জোসেফ স্টিগলিৎজ ও পল ক্রুগম্যানের নেতৃত্বে একদল অর্থনীতিবিদ ঐ আশির দশক থেকেই প্রমাণ করে চলেছেন যে "মুক্তবাজার অর্থনীতি' ছদ্মবেশধারী 'বাজার মৌলবাদী পুঁজিবাদ' একটি ভ্রান্ত দর্শন। 'বাজারব্যবস্থা ও ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান মিলবে, অতএব রাষ্ট্রের ভূমিকাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে ফেলো'—এমন ধারণাকে স্টিগলিৎজ নাম দিয়েছেন বাজার মৌলবাদীদের 'অযৌক্তিক উচ্ছ্বাস' (irrational exuberance)। ২০১২ সালে প্রকাশিত বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফরাসী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি'র বেস্ট সেলার *Capital in the Twenty First Century* বইয়েও যে হাইপোথেসিসটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা হলো, রাষ্ট্র যদি অত্যন্ত কঠোরভাবে আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টনকারীর ভূমিকা পালন না করে তাহলে উন্নত-অনুন্নতনির্বিশেষে বিশ্বের সকল দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য বাড়তে বাড়তে অতি দ্রুত বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যাবেই। সাইমন কুজনেৎস যে এক পর্যায়ে উন্নত দেশগুলোতে বৈষম্য আর বাড়বে না বলে তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেটাকে পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে পিকেটি'র বইয়ে। তিনি মনে করেন, অত্যন্ত প্রগতিশীল আয়করব্যবস্থা, সম্পত্তি করব্যবস্থা এবং বিশ্বব্যাপী পুঁজির ওপর 'গ্লোবাল ট্যাক্স' বসানোর মাধ্যমে এই আসন্ন মহাবিপদকে ঠেকানোর প্রয়োজনকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। পিকেটি অবশ্য ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোকে এ ব্যাপারে তাঁর আদর্শ মনে করেন। টমাস পিকেটি তাঁর বইয়ে কার্ল মার্ক্সকে কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তদ্সত্ত্বেও 'বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি কৌশল' অবলম্বনের জন্য তাঁর আকুতি ফুটে উঠেছে তাঁর বইয়ের উপসংহারে।

৫. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের নানাবিধ ডাইমেনশন

আয়বৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য বাড়তে থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবে সমাজে ও অর্থনীতিতে আরও অনেকগুলো ডাইমেনশনে বৈষম্য, বঞ্চনা ও স্বাধীনতাহীনতা (unfreedom) চরমাকার ধারণ করে। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 'সিস্টেম' প্রতিনিয়ত সমাজে বৈষম্য ও বঞ্চনা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করে চলেছে। এর মানে, আয় ও সম্পদবৈষম্যবৃদ্ধি সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারলে দেশের জনগণের দারিদ্র্য নিরসন আরও বেগবান হতো, ভিয়েতনাম এবং গণচীন গত চার দশকে যেটা প্রমাণ করেছে। (অবশ্য, এসব দেশের জনগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাহীনতার

শিকার।) দারিদ্র্য বিষয়ে মাঠপর্যায়ের গবেষণা এবং তাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত আমার বই *The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh* এ মোট ১২টি প্রধান ডাইমেনশনে বা প্রক্রিয়ায় এ দেশে বৈষম্য বৃদ্ধি, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ১২টি ডাইমেনশন হলো:

১. দারিদ্র্য সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র কৃষিব্যবস্থা (agrarian system);
২. ক্রমবর্ধমান বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা;
৩. স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণ;
৪. সরকারি রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আহরণ ও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ;
৫. ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের সঞ্চয়কে উচ্চবিত্ত জনগণের খেদমতে পাচার;
৬. বৈদেশিক ঋণ/অনুদান আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
৭. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অব্যাহত ব্যর্থতা;
৮. আমদানি উদারীকরণ ও চোরাচালান এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওপর এগুলোর মিলিত প্রভাব;
৯. সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার রাজধানী-কেন্দ্রিকতা এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এর ফলে সৃষ্ট বঞ্চনা;
১০. স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অকার্যকরকরণ ও বি-ক্ষমতায়ন (disempowerment);
১১. রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন; এবং
১২. রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা (governance failure) এবং সুশাসনের অভাব।

উপরে উল্লিখিত ১২টি ডাইমেনশনের প্রধান কয়েকটি বৈষম্য বৃদ্ধিকারী ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করছি:

৫.১ কৃষিব্যবস্থায় বৈষম্যবৃদ্ধি, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি

দেশের কৃষিব্যবস্থায় নিচে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বৈষম্য, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে:

ক) জমির মালিকানাব্যবস্থায় মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষক-ভূমি মালিকদের প্রাধান্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে, এবং জমির মালিকানা অনুপস্থিত ভূস্বামীদের কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে যাচ্ছে।

খ) কৃষিতে ভূমিহীনতা সমস্যা বাড়তে বাড়তে এখন গ্রামীণ পরিবারগুলোর ৮২ শতাংশই ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে।

গ) কৃষিকাজে মালিক-কৃষকের তুলনায় বর্গাদার কৃষকের অনুপাত ক্রমবর্ধমান। এখন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ভূমিমালিক-কৃষকেরা অপরের জমি বর্গা বা ইজারা নিয়ে কৃষিকাজে নিয়োজিত থেকে পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজন মেটানোর সংগ্রামে নিয়োজিত।

ঘ) কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের অব্যাহত দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষক ফসলের ন্যায্যদাম থেকে আজও চরমভাবে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।

ঙ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারগুলো ঋণের ফাঁদে দিন-দিন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। ক্ষুদ্রঋণের প্রসারের কারণে মহাজনী ঋণের দৌরাত্ম্য খানিকটা কমলেও একাধিক এনজিও

থেকে বারবার ঋণ নিয়ে ব্যয়বহুল ভোগে অপব্যয় করে ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ছেন কৃষক। ব্যাংকিংব্যবস্থা আজও কৃষকের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে।

চ) বন্যা, সাইক্লোন, নদীভাঙন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মহীনতা ও বেকারত্বের শিকার হয়ে কৃষিখাতে এখনো প্রান্তিকীকরণ ও নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, যা গ্রাম থেকে নগরমুখী অভিগমনকে বেগবান করে চলেছে।

ছ) কৃষকের সন্তান মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে আজও বঞ্চিত। যুগোপযোগিতাহীন মাদ্রাসাগুলোই কৃষক সন্তানের শিক্ষার অন্যতম প্রধান জোগানদার রয়ে গেছে আজও। সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক লেভেলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ছে প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষকের ছেলেমেয়ে।

জ) কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে ছদ্মবেকারত্ব ও মৌসুমী বেকারত্ব এখনো গেঁড়ে বসে রয়েছে কৃষিখাতে। বৈদেশিক অভিবাসন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অধিকাংশ কৃষক পরিবারের সন্তানেরা এখনো জমি বিক্রয় ছাড়া বিদেশে যেতে পারে না।

৫.২ বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা

আশির দশক থেকে 'মুক্তবাজার অর্থনীতির' ডামাডোলে শরিক হয়ে গত ৩৯ বছরে আমরা শিক্ষার বাজারীকরণ ও পণ্যকরণের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আর এ জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা মহাসুখে বাজারের হাতে সোপর্দ করে চলেছি। এর পরিণামে শিক্ষা আজ এ দেশে বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে, যেখানে ধনাঢ্য মা-বাবার সন্তানদের জন্য প্রাথমিক লেভেল থেকে উচ্চতম শিক্ষার পর্যায়ে মহার্ঘ্য পণ্য হিসেবে উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা বিক্রয়ের হাজার হাজার মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি নাটকীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, নিম্নবিত্ত মা-বাবার সন্তানদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে। উন্নত পুঁজিবাদী কোনো দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বাজারব্যবস্থাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, অথচ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া—কোনো দেশেই প্রাথমিক শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বাজারকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। একক মানসম্পন্ন একক পাঠ্যসূচির বাইরে যার যা ইচ্ছা পড়াতেও দেওয়া হয় না। দেশের সংবিধানের ১৭ (ক) ধারায় রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছে অঙ্গীকার করছে যে 'রাষ্ট্র সকল শিশুর জন্য একটি একক মানসম্পন্ন, গণমুখী, সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত চালু করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে'। এই সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার পাশাপাশি দেশের সকল প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করেছিল। ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের যে প্রতিবেদনটি সরকার গ্রহণ করেছিল তাতে ঐ বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও একক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব ছিল। জাতির দুর্ভাগ্য, কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করেছে মর্মে সরকারি গেজেট প্রকাশিত হওয়ার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছিলেন। ঐ রিপোর্টের সুপারিশগুলো ১৯৭৫-১৯৯৬ এর ২১ বছরে কোনো সরকারেরই সুবিবেচনা পায়নি, যদিও জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়ার সরকার নিজেদের পছন্দমাফিক একাধিক শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠন করেছে এবং শিক্ষা নিয়ে এন্তার 'তুঘলকি এক্সপেরিমেন্ট'

চালিয়েছে। এমনকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদের সরকার কর্তৃক গঠিত 'শামসুল হক কমিটির' রিপোর্টেও এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার কর্তৃক প্রফেসর কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারটিকে বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং বর্তমানে তা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিন্তু, বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের বিষয়ে বর্তমান সরকারকে বেশ খানিকটা দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে।

শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শিশুকে ১১ ধরনের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার জালে আটকে ফেলার এহেন নৈরাজ্যকর বন্দোবস্তের নজির বিশ্বের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিতামাতার বিত্তের নিক্তিতে ওজন করে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে কে কিন্ডারগার্টেনে যাবে, কে সরকারি বা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে সুযোগ পাবে, কার এনজিও স্কুলে ঠাঁই হবে, আর কাকে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় পাঠিয়ে বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন যে 'লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে' ভাতটা তো অন্তত জুটল! এভাবে সারাজীবনের জন্যে ঐ শিশুকে বৈষম্যের অসহায় শিকারে পরিণত করে ফেললাম আমরা, যা তার মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বড় হয়ে সে বাবা-মাকে অভিশাপ দেবে কিংবা পরিবারের দারিদ্র্যকে দোষ দেবে তাকে ভুল স্কুলে বা মাদ্রাসায় পাঠানোর জন্যে, কিন্তু তখন আর ভুল সংশোধনের কোনো উপায় থাকবে না। এর অপর পিঠে দেশে ইংরেজি মাধ্যম কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যাবৃদ্ধিকেও নাটকীয় বলা চলে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্য এখন আর বাংলা মাধ্যম প্রাইমারি স্কুলগুলোকে উপযুক্ত মানসম্পন্ন মনে করছেন না, কিন্ডারগার্টেনে পড়ানোটাই নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে গত চার দশকে। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও চারটি ধারার সমান্তরাল অবস্থান এখন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে—ইংরেজি মাধ্যমের নানান কিসিমের মহার্ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মূলধারার বাংলা মাধ্যম সরকারি স্কুল, বাংলা মাধ্যম বেসরকারি স্কুল এবং কয়েক ধরনের মাদ্রাসা। এই বিভাজিত ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এক দেশের মধ্যে চার চারটি পৃথক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে চলেছি।

৫.৩ স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাজারীকরণ

আশির দশক থেকে বাংলাদেশে চিকিৎসাব্যবস্থার বাজারীকরণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ফলে, দেশের নগর-গ্রামনির্বিশেষে আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের দ্রুত বিকাশ পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে মুনাফাবাজির অসহায় শিকারে পরিণত করেছে। এহেন বাজারীকরণ স্বাস্থ্যখাতকে মহার্ঘ্য পণ্যের বাজার ও অমানবিক বৈষম্যের লীলাক্ষেত্র করে ফেলেছে, যেটাকে আমি দারিদ্র্য সৃষ্টির কারখানা অভিহিত করে চলেছি। কারণ, ব্যক্তিখাতের মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণের সাধ্যের বাইরে হলেও সহায়-সম্পত্তি বিক্রয় করে তারা ঐ মহার্ঘ্য সেবা পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হওয়াই স্বাভাবিক। আবার, ব্যক্তিখাতের স্বাস্থ্যসেবার এহেন দৌরাত্ম্যের কারণে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ পঙ্গু হয়ে 'মরণের কারখানায়' পরিণত হচ্ছে।

৫.৪ ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের সঞ্চয়কে উচ্চবিত্ত জনগণের খেদমতে পাচার

দেশের ব্যাংকিংব্যবস্থায় কয়েক হাজার ধনাঢ্য রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের কারণে ব্যাংকিং এখন পুঁজি লুণ্ঠনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আরও ন্যক্কারজনক হলো, ব্যাংকের ঋণ ফেরত না দেওয়ার কালচার এখন দুরারোগ্য ক্যানসারে পরিণত হয়েছে রাঘববোয়াল

ঋণখেলাপিদের সাথে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর যোগসাজশের কারণে। ব্যাংকিং এখন দেশ থেকে পুঁজি পাচারেরও সারবান ক্ষেত্র।

৫.৫ ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি আয় ও সম্পদ বৈষম্য বাড়াচ্ছে। দুর্নীতি এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

৫.৬ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার রাজধানী-কেন্দ্রিকতা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও বঞ্চনা সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতার পর গত ৪৮ বছরে রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা বিস্ফোরণমূলক প্রবৃদ্ধির শিকার হওয়ায় ঢাকা এখন প্রায় দু'কোটি জনসংখ্যার মেগাপলিসে পরিণত হয়েছে, যার ৪০ শতাংশ অধিবাসী বস্তীবাসী। ফলে, ঢাকাকে এখন বিশ্বের 'দ্বিতীয় বসবাস-অযোগ্য' নগরী (second most unlivable city) আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

৫.৭ সরকারি রাজস্বব্যবস্থা ও ব্যয়ব্যবস্থা দেশে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। রাজস্বব্যবস্থা এখনো পরোক্ষ করসমূহের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল। ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোকে আয়কর ও সম্পত্তি করের আওতায় আনতে সরকার এখনো অনেকখানি ব্যর্থ রয়ে গেছে। সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ এখনো সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মতো অনুৎপাদনশীল খাতসমূহের খাই মেটাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

৫.৮ স্থানীয় সরকারব্যবস্থার তুলনামূলক দুর্বলতা, বি-ক্ষমতায়ন (de-empowerment) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের থোক অর্থ-বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীলতা গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়নের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে চলেছে।

৫.৯ রাজনীতির বৈশ্যকরণ (commercialization) ও দুর্বৃত্তায়ন (criminalization), চাঁদাবাজি, মাস্তানতন্ত্র ও দখলবাজির অসহায় শিকার সাধারণ জনগণ চরম স্বাধীনতাহীনতার কবলে বন্দী। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সংসদের ৬১.৭ শতাংশ সদস্য ব্যবসায়ী। অতএব বলা চলে, বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতি এখন লোভনীয় ব্যবসায়ে পর্যবসিত হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সমস্যার সমাধান কোন্ পথে?

ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যা মোকাবিলা করা দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টন খুবই কঠিন রাজনৈতিক নীতি-পরিবর্তন ছাড়া অর্জন করা যায় না। সমাজের শক্তিধর ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর কায়েমী স্বার্থ আয় পুনবণ্টন নীতিমালাকে ভণ্ডুল করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেই। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, গণচীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইসরায়েল এবং শ্রীলংকায় রাষ্ট্র নানারকম কার্যকর আয় পুনবণ্টন কার্যক্রম গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিনি সহগ বৃদ্ধিকে শ্লথ করতে বা থামিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বিশ্বে জিনি সহগ কমানোর ব্যাপারে কিউবা ছাড়া অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশকে তেমন একটা সাফল্য অর্জন করতে দেখা যাচ্ছে না। এই দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, গণচীন ও ভিয়েতনাম এখনো নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবি করে, বাকি দেশগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসারী হয়েও শক্তিশালী বৈষম্য-নিরসন নীতিমালা গ্রহণ করে চলেছে। উপরের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সফল ভূমি সংস্কার এবং/অথবা কৃষি সংস্কার নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়েছে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির মতো ইউরোপের কল্যাণ-রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় নীতি অনেক বেশি

আয়-পুনর্বণ্টনমূলক, যেখানে অত্যন্ত প্রগতিশীল আয়কর এবং সম্পত্তি করের মতো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে জিডিপির ৩০-৩৫ শতাংশ সরকারি রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করে ঐ রাজস্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা (প্রধানত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর পেনশন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন), পরিবেশ উন্নয়ন, নিম্নবিত্ত পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, গণপরিবহন, বেকার ভাতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। এই রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা বাহিনী, সিভিল আমলাতন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্যে সরকারি ব্যয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে খুবই অনুল্লেখ্য। এই কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোতে এবং বৈষম্য-সচেতন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে কয়েকটি বিষয়ে মিল দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো:

১. রাষ্ট্রগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল লেভেলের শিক্ষায় একক মানসম্পন্ন, সর্বজনীন, আধুনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে।

২. রাষ্ট্রগুলোতে অত্যন্ত সফলভাবে জনগণের সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৩. রাষ্ট্রগুলোতে প্রবীণদের পেনশনব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৪. রাষ্ট্রগুলোতে সর্বজনীন বেকার ভাতা চালু রয়েছে।

৫. এসব দেশে নিম্নবিত্ত জনগণের জন্যে ভর্তুকি মূল্যে রেশন বা বিনামূল্যে খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে।

৬. প্রবীণ জনগণের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্যে অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা উন্নত-উন্নয়নশীল নির্বিশেষে এসব দেশে চালু রয়েছে।

৭. এসব দেশে গণপরিবহন সুলভ ও ব্যয়সাশ্রয়ী, এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়।

৮. এসব দেশে রাষ্ট্র 'জিরো টলারেন্স অগ্রাধিকার' দিয়ে দুর্নীতি দমনে কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

৯. এসব দেশ 'মেগাসিটি' উন্নয়নকে সফলভাবে নিরুৎসাহিত করে চলেছে এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে খুবই মনোযোগী।

১০ দেশগুলোতে 'ন্যূনতম মজুরির হার' নির্ধারণ করে কঠোরভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

১১. নিম্নবিত্তদের আবাসনকে সব দেশেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২. এসব দেশে কৃষকেরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য দাম পান তার জন্যে কার্যকর সরকারি নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩. ব্যক্তিখাতের বিক্রেতারা যেন জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সে জন্যে এসব দেশে রাষ্ট্র কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

'কেরালা মডেল' থেকে বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট রাজ্য কেরালা বিশ্বকে 'উন্নয়নের কেরালা মডেল' উপহার দিয়েছে। উইকিপিডিয়ার তথ্য মোতাবেক ২০১৮ সালে কেরালার জনগণের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ২৪০০ ডলার, যা ভারতের জনগণের গড় মাথাপিছু জিডিপি ১৯৮৩ ডলারের চাইতে সামান্য বেশি। ক্রয়ক্ষমতার সাম্য বা পিপিপি ভিত্তিতে কেরালার মাথাপিছু জিডিপি ২০১৮ সালে ৯২০০ পিপিপি ডলার। কিন্তু, মানব উন্নয়ন সূচকের

স্কোরে কেরালা ভারতের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ১৯৯০ সাল থেকেই। সর্বশেষ ২০১৮ সালের কেরালার এইচডিআই সূচক ০.৭৮৪ ভারতের এইচডিআই সূচক ০.৬৪ এর তুলনায় এত বেশি যে সেটাকে বরং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ের বলে বিবেচনা করা হয়। শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, জন্মহার, মৃত্যুহার, মোট প্রজনন হার (total fertility rate), জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, সর্বপর্যায়ের শিক্ষিতের হার, মৌল স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, ভর্তুকি দামে খাদ্য-রেশন ও ফিডিংব্যবস্থা, চিকিৎসক-জনসংখ্যা অনুপাত—এধরনের তাবৎ সামাজিক সূচকেও কেরালা অনেক উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। কেরালার জনগণ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত এবং প্রায় শতভাগ মৌল স্বাস্থ্যসুবিধা ও চিকিৎসা সুবিধার আওতায় চলে এসেছে। কেরালার নিম্ন-আয়ের মানুষ বিপুল ভর্তুকি-দামে রেশনের চাল কিনছেন। কেরালার সকল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিং-এর আওতায় চলে এসেছে। কেরালার সকল প্রবীণ কৃষক মাসিক পেনশন পান। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও কেরালাই ভারতের পথিকৃৎ। জনগণের মাথাপিছু জিডিপি কম হলেই যে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যপীড়িত হবে—বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রতীচ্যের উন্নয়ন-তাত্ত্বিকদের এই মাথাপিছু আয়কেন্দ্রিক ধারণাকে যে দুটো উন্নয়ন-মডেল সবার আগে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছিল তার একটি হলো সমাজতান্ত্রিক কিউবা, অপরটি কেরালা। মাথাপিছু জিডিপি বিভিন্ন দেশের মানবকল্যাণ তুলনার জন্যে উপযুক্ত নয়—এই ধারণার ক্ল্যাসিক উদাহরণ কেরালা। মাথাপিছু জিডিপি বেশি না হলেও যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মতো একটি নিম্ন আয়ের দেশেও ঈর্ষণীয় জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়—কেরালার জনগণ তৃতীয় বিশ্বে তার সফলতম নজির সৃষ্টি করেছে। ন্যায়বিচার সমুন্নতকারী প্রবৃদ্ধি (equitable growth) মডেলের এক অনন্য নজির কেরালা। আয় ও সম্পদবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনগণের মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে রাজ্যটি। কেরালায় পরমতসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে এই দুটো জোট পালাক্রমে ক্ষমতায় এলেও কোনো সরকারই পূর্ববর্তী সরকারের গণমুখী পরিবর্তনগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে না, নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

১৯৫৬ সালে যখন ত্রাবাঙ্কোর, কোচিন ও মালাবার অঞ্চল নিয়ে কেরালা রাজ্য গঠিত হয় তখন এর পরিচিতি ছিল ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভূস্বামী-অধ্যুষিত রাজ্য হিসেবে। ষাট ও সত্তরের দশকে কেরালার আরেকটি বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ছিল বিএ-এমএ পাস রিকশাওয়ালা—বেকার সমস্যা ছিল এতই প্রকট। ১৯৫৭ সালে কেরালায় অত্যন্ত প্রগতিশীল কৃষি সংস্কারকে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান অগ্রাধিকার ঘোষণা করে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নির্বাচনে জিতে ক্ষমতাসীন হয়। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে অবাধ নির্বাচনে জিতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সর্বপ্রথম কেরালায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষমতায় এসে ১৯৫৯ সালেই কেরালার কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতে প্রথম ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করে, যেটাকে তখনকার ভারতের কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভণ্ডুল করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। জওহরলাল নেহরুর সরকার কেরালার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে, কিন্তু বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় ফিরে আসে। ১৯৬৯ সালে আরেকটি কম্যুনিস্ট-নেতৃত্বাধীন সরকার 'লাঙল যার জমি তার' নীতির ভিত্তিতে ভূমি মালিকানার ব্যাপক পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি সংস্কার আইন পার করে, যার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছিল: ১) কোনো পরিবারকে আট হেক্টরের বেশি জমির মালিকানা রাখতে না দেওয়া, ২) ভাগচাষি (tenant farmer) ও বর্গাদার কৃষকদেরকে তাদের চাষকৃত জমির কার্যকর মালিকে (virtual owners) পরিণত করা, ৩)

মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে উৎখাত, ৪) কৃষিজোতের একত্রীকরণ, এবং ৫) তৃণমূল জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের কৃষি সংস্কারের কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ (mass mobilization)। কেরালার ভূমির মালিকানা পুনর্বণ্টন কর্মসূচি থেকে ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে, যেটা পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত ভূমি সংস্কার আইনমালা 'অপারেশন বর্গা' এর তুলনায় অনেক কমসংখ্যক। কিন্তু, কেরালার কৃষি সংস্কারমালা খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের সংগঠন জোরদারকরণে অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যার ফলে তৃণমূল গণতন্ত্র ও 'কল্যাণ অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠায় কেরালা মডেল অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। নিচের পরিবর্তনগুলো কেরালা মডেলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে প্রশংসনীয়: ১) কার্যকর ও কম দুর্নীতিপূর্ণ রেশনব্যবস্থা ও ফিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভর্তুকি-দামে নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর মধ্যে চাল-বিতরণ. ২) খেতমজুরদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাবিধান এবং নিম্নতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, ৩) অবসরপ্রাপ্ত ও বর্ষীয়ান কৃষিশ্রমিকদের জন্যে পেনশন চালু, ৪) দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীসমূহের জন্যে বর্ধিত সরকারি চাকরি, ৫) বর্গাদারদের ভূমিস্বত্বের নিরাপত্তা (security of tenure) জোরদারকরণ এবং জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের আশঙ্কা নিরসন, ৬) গ্রামীণ ভিটেমাটিতে বসবাসরতদের দখলিস্বত্ব প্রদান, ৭) ভূমিহীন পরিবারগুলোকে বসতবাটি নির্মাণের জন্যে প্লট প্রদান, ৮) কৃষিশ্রমিকদের দৈনিক সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা নির্ধারণ এবং তাদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম চালু, ৯) গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসুবিধা বৃদ্ধির জন্যে সরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতাল নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং ১০) অনুপস্থিত ভূমি মালিকানা উৎসাদন। যেহেতু কেরালার জনগণ প্রায় শতভাগ শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রবল সচেতন তাই তারা সংগঠিত হয়ে রাজনীতিবিদ ও আমলাদেরকে সার্বক্ষণিক সজাগ ভূমিকা পালনে বাধ্য করে চলেছে। নির্বাচনে মাঝে মাঝে বামপন্থীরা হেরে গেলেও জনগণের জোরদার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও সার্বক্ষণিক মনিটরিং কয়েকবার নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ সরকারগুলোকেও সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে বাধ্য করেছে। আরও চমকপ্রদ হলো, মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ মানবপুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রে কেরালা ভারতে চ্যাম্পিয়ন। কেরালার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বিশ্বখ্যাত এনজিও অক্সফাম কর্তৃক বৈষম্য কমানোর প্রতিশ্রুতি সূচকের (commitment to reducing inequality index) বিবেচনায় ১৫৭টি দেশের যে র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৮, যেটা দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে সপ্তম (মানে খুবই হতাশাজনক)। সামাজিক খাতসমূহে ব্যয়, করারোপ এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সরকারের প্রয়াস—এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে। একমাত্র ভুটান বাংলাদেশের চাইতে এই সূচকে খারাপ অবস্থানে রয়েছে ১৫২ নম্বরে। ঐ র‍্যাংকিং-এ দক্ষিণ এশিয়ার বাকি ছয়টি দেশের অবস্থান: মালদ্বীপ-৬৮তম, শ্রীলংকা-১০২তম, আফগানিস্তান-১২৭তম, পাকিস্তান-১৩৭তম, নেপাল-১৩৯তম এবং ভারত-১৪৭তম। এর মানে, বৈষম্য নিরসনের ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তেমন মনোযোগী নয়, এবং সূচকের তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির অভাব প্রকটভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈষম্যের ব্যাপারে এহেন অবজ্ঞার মানসিকতাকে আমি 'সংকটজনক' অভিহিত করতে চাই। 'ধনকুবেরের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' এই সংকটেরই ঢক্কা-নিনাদ বাজিয়ে গেল। 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের' মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার এই কলঙ্কতিলক এখন বাংলাদেশের কপালে শোভা পাচ্ছে বৈষম্য নিরসনের প্রতি রাষ্ট্রের এই নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। কেরালা মডেল ২০১৭ সালে প্রকাশিত আমার বই "*বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র ও অনুন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দৃষ্টিকোণ*

থেকে" এর উপসংহারে আমি বলেছি, 'বাংলাদেশে 'রাজনীতিক-সামরিকএস্টাবলিশমেন্ট-সিভিল আমলাতন্ত্র-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি—এই চার গোষ্ঠীর 'গ্র্যান্ড এলায়েন্স' রাষ্ট্রক্ষমতাকে একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজি আহরণের লোভনীয় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই, ভোটের রাজনীতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে 'ঘুষ ও ঘুষির' রাজত্বে পর্যবসিত হয়েছে। আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে সন্ত্রাসী-মাস্তান-কালো টাকার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে তার পেছনে রাজনীতির বৈশ্যকরণ (commercialization) ও দুর্বৃত্তায়ন (criminalization) প্রক্রিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করছে, এবং রাষ্ট্রচরিত্রই নিঃসন্দেহে তার জন্যে সঞ্চটক উপাদান। গ্রন্থের মূল অনুসিদ্ধান্ত হলো, রাষ্ট্রচরিত্রই বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ, এ দেশের রাষ্ট্র উৎপাদনশীল জনগণের স্বার্থের পাহারাদার না হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী অধিপতি গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত উপরে উল্লিখিত 'গ্র্যান্ড এলায়েন্সের' অনর্জিত দুর্নীতিজাত খাজনা এবং মুনাফা আহরণের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার পরিণামে আন্দ্রে গুন্দার ফ্রাঙ্ক কথিত 'উদ্বৃত্ত আহরণ ও উদ্বৃত্ত আত্মসাতের' (surplus expropriation and surplus appropriation) প্রধান ধারাটির পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এসেমগলু ও রবিনসন এ ধরনের রাষ্ট্রকেই 'পুঁজি লুণ্ঠনমূলক রাষ্ট্র' (extractive state) বলে অভিহিত করেছেন। অথচ, নিউলিবারেল বাজার মৌলবাদী কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচির (structural adjustment program) প্রেসক্রিপশান অনুসারে ১৯৭৫ সাল থেকে, এবং বিশেষত আশির দশক থেকে, উৎপাদন ও বণ্টন থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুটিয়ে নিয়ে 'মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বিকল্প হিসেবে আঁকড়ে ধরতে চাওয়ায় অর্থনীতিতে গত চার দশকে অনেকগুলো ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, দেশে দুর্নীতি এবং পুঁজি লুণ্ঠন বেলাগামভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে, বৈধ অর্থনীতির সমান্তরালে একটি কালো অর্থনীতি বিস্তার লাভ করছে। এহেন কালো অর্থনীতি ইতিমধ্যেই বৈধ অর্থনীতির ৭০-৭৫ শতাংশের মতো আকার ধারণ করেছে বলে কেউ কেউ দাবি করছেন, তবে এ ধরনের দাবির সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা দুরূহ। খ্যাতনামা ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য ইকোনমিস্ট* বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থাকে 'চৌর্যতন্ত্র' (kleptocracy) নামে অভিহিত করেছে। আমি এই শাসনকে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম (crony capitalism) বা স্বজনতোষী পুঁজিবাদ'-এর ক্লাসিক নজির হিসেবে অভিহিত করে চলেছি। জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলের তিন সরকার-প্রধান এরশাদ, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমকে লালন করে চলেছেন, যার ফলে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, ক্ষমতাসীন দল বা জোটের নেতা-কর্মী এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, সামরিক অফিসার এবং আমলারা পুঁজি লুণ্ঠনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে ধন-সম্পদ আহরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে এ দেশে সৎভাবে ধন-সম্পদের মালিক হওয়া প্রায় অসম্ভব বিবেচিত হয়ে থাকে। ব্যাংক-ঋণ লোপাট, সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারি, বৈদেশিক ঋণের অর্থে বাস্তবায়িত উন্নয়ন-প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টতা, শেয়ার বাজার ম্যানিপুলেশান, ব্যাংকের মালিকানা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের মালিকানা, টিভি নেটওয়ার্কের মালিকানা, চোরাচালান, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি, আমদানি বাণিজ্য, রিয়াল এস্টেট, চাঁদাবাজি ও মাস্তানি—এগুলোই এ দেশে দ্রুত ধন-সম্পদ আহরণের লোভনীয় ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সাফল্যের অপরিহার্য উপাদান। রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এ দেশে ক্রমেই 'সিস্টেমে' পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ঘুষ ছাড়া কোনো সরকারি সেবা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। পূর্বে কাস্টমস, আয়কর, ভ্যাট, পুলিশ বিভাগ, বিজিবি (বিডিআর), ভূমি সংক্রান্ত বিভাগসমূহ, পূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বিআরটিএ—

ওগুলোকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এখন এমন একটি সরকারি বিভাগ বা এজেন্সির নাম করা যাবে না যেখানে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেনি। যেটা আরও দুঃখজনক তাহলো, গত ২৮ বছর ধরে ভোটের রাজনীতি চালু থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ দোর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে চলেছে। এ ব্যাপারে জাতীয় পার্টি, বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কোনো ফারাক করা যাচ্ছে না। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারেও তাই এই তিনটি দলের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যা জনগণের হয়রানি, বঞ্চনা, হতাশা ও ক্ষোভকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকারের সদিচ্ছার অভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) 'নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্রে' পরিণত হয়েছে বলে খোদ দুদকের দু'জন সাবেক চেয়ারম্যানই অভিযোগ তুলেছেন। এ দেশে সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেম যেন বোকামি!

উপরে উল্লেখিত 'ক্লেপ্টোক্রেসি' এবং 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' এ দেশে আয়বৈষম্য এবং অন্যান্য ধরনের বৈষম্যকে ক্রমেই পর্বতপ্রমাণ করে তুলছে। বৈষম্য নিরসনের জন্যে প্রথম করণীয় হলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে হবে। অবাধ, সুষ্ঠু ও জালিয়াতিমুক্ত নির্বাচনে জনগণের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা যাতে কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারেন সে ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতেই হবে। জনগণের কাছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সার্বক্ষণিক জবাবদিহি যাতে নিশ্চিত করা যায় তার ব্যবস্থাকেও প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হবে। বর্তমানে সংবিধানের কয়েকটি ত্রুটির কারণে গণতন্ত্রের নামে যে 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব' কায়েম হয়ে গেছে তা সংশোধনের জন্যে সংবিধান সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সংবিধানের ৭০ ধারার আওতা সংকুচিত করে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স মোশনের' ক্ষেত্রে সরকারি দল বা জোটের সাংসদদের সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অধিকার খর্ব করে অন্য যে কোন+- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীন ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। সরকারের তিনটি অঙ্গ সংসদ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে অন্য দুটো বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই, এক্ষেত্রেও সংবিধান সংশোধন ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংসদের কাছে মন্ত্রিসভার যৌথ জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে, এক্ষেত্রেও শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে মন্ত্রীদের জবাবদিহি গণতন্ত্রের জন্যে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা। রুলস অব বিজনেসেও প্রধানমন্ত্রীকে যে ঢালাও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে একক ক্ষমতাশালী করার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে যেভাবে ক্ষমতাহীন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে ফেলা হয়েছে সেটাও খুব লজ্জাজনক। সরকারের এহেন ভারসাম্যহীনতা সংশোধন না করা হলে 'নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব' থেকে জাতির পরিত্রাণ মিলবে না।

আয়বৈষম্যের লাগাম টেনে ধরতে চাইলে 'বাজার ব্যর্থতা' কেন হয় তা ভালোভাবে বুঝে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। বাজার ব্যর্থ হয় গরীবের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে, ব্যর্থ হয় পরিবেশ দূষণের মতো নেতিবাচক বাহ্যিকতাগুলো ঠেকাতে, ব্যর্থ হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলায়, ব্যর্থ হয় নানারকম মনোপলি ও অলিগোপলির কারণে, ব্যর্থ হয় গণদ্রব্য বা 'পাবলিক গুড' জোগান দিতে। মূল কথা হলো, রাষ্ট্রকে বৈষম্য নিরসনকারীর ভূমিকা নিতেই হবে, যেরকম করা হয়েছে ভিয়েতনামে, গণচীনে কিংবা ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোতে। সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে প্রধানত সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের আয়কর ও সম্পত্তি কর থেকে। সরকারি ব্যয়ের প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে বৈষম্যহীন ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষায়, গরীবের জন্য ভালো মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলায়, মানসম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে,

গরীবের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে। যেখানে সুযোগ থাকে সেখানেই কৃষক সমবায় সমিতি গড়ে তুলে কৃষককে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যদাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শ্রমজীবী জনগণকে ন্যায্য মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে রাষ্ট্র কঠোর অভিভাবকের ভূমিকা নেবে। যেখানে সম্ভব সেখানে গণচীন ও ভিয়েতনামের মতো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলোর হাতে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। গণচীনের Township and Village Enterprise (TVE) মডেল এক্ষেত্রে অনুকরণীয় হতে পারে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, ইত্যাদি পাবলিক ইউটিলিটিজ সরবরাহ ক্রমশ ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দিয়ে সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সেজন্যে সরকারকে কঠোর দাম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যান্য ব্যক্তিখাতের বিক্রেতারাও যাতে জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্রকে কঠোর 'প্রতিযোগিতা আইনের' সহায়তায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। নিউ লিবারেলিজমের মৌতাতে মশগুল হয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা যেনতেনভাবে সংকোচন মোটেও যৌক্তক হতে পারেনা।

আমি বিশ্বাস করি, ২০১১ সালে সংবিধানে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে পুনর্বহাল হলেও একুশ শতকের বাস্তবতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে 'রাষ্ট্রতন্ত্র' (স্টেটিজম) এবং একদলীয় পুলিশি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে মডেলগুলো বিংশ শতাব্দীর আশির ও নব্বইয়ের দশকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে সেগুলোকে আর ফেরত আনা যাবে না। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের ঘটনাগুলো থেকে যে বিষয়টা সামনে চলে এসেছে তাহলো, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি খাত ও বাজারকে প্রতিপক্ষ অবস্থানে ঠেলে দেওয়া যৌক্তিক নয়। বাজার এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা হওয়া উচিত পরিপূরকের। কিছু কাজ বাজার ও ব্যক্তিখাত ভালো করবে, আর কিছু কাজ রাষ্ট্র ভালো করবে। কতগুলো বিষয়ে বাজার ব্যর্থ হবে, আবার ব্যক্তিখাতের অক্ষমতা ও বাজার ব্যর্থতা (মার্কেট ফেইল্যুর) থেকে মুক্তির আশায় রাষ্ট্রের হাতে ঐ বিষয়গুলো অর্পণ করা হলে রাষ্ট্রব্যর্থতা (স্টেট ফেইল্যুর) ও দুর্নীতি এড়ানো কঠিন হবে। রাষ্ট্র ও বাজারের পরিপূরক ভূমিকাকে মেনে নিয়ে এই দুটো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণের সঠিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। বাজার ও রাষ্ট্রের যৌক্তিক ভূমিকা নির্ধারণের যে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট গণচীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইসরায়েল, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বলিভিয়া, এল সালভাদর, ইকুয়েডর ও কিউবায় প্রযুক্ত হয়ে চলেছে তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। এই দেশগুলোতে রাষ্ট্রকে আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টনের এজেন্সি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার, ব্যক্তিখাত ও বাজারব্যবস্থাকেও অযৌক্তিকভাবে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে না। মানে, জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও দারিদ্র্য-নিরোধক কার্যক্রম, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ—এ ধরনের গণমুখী খাতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে, প্রগতিশীল আয়কর ও সম্পত্তি করের মাধ্যমে সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ আহরণ করে ঐ পুনর্বণ্টনমূলক সরকারি ব্যয়ের অর্থায়ন করা হচ্ছে। ফলে, এই দেশগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং বিকাশমান ব্যক্তিখাত ও সুশাসিত বাজারের (governed market) সমন্বয়ে ক্রমেই উন্নয়নের সফল মডেল হিসেবে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাষ্ট্র যদি প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সিভিল প্রশাসনের মতো অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সমর্থ হয় তাহলে যে ব্যয় সাশ্রয় হবে তা দিয়ে উপরে উল্লিখিত সামাজিকভাবে কাম্য কার্যক্রমগুলোতে রাষ্ট্র অর্থবহ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হবে।

উপরে উল্লেখিত দর্শনকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও বাজারের ভূমিকার সঠিক বিভাজন ও সমন্বয়ের দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করে নিম্নের প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করা হলো:

১। অর্থনীতির বৃহত্তম ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন খাত কৃষিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিব্যবস্থা অব্যাহত রেখে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার এবং কৃষি সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়নকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে গুরুত্ব দিতে হবে। জমির মালিকানার সিলিং অবনমনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন যেমনি এরূপ সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনি বর্গা প্রথার সংস্কার, অনুপস্থিত ভূমি মালিকানাব্যবস্থা বিলোপ, কৃষিশ্রম বাজার সংস্কারের মাধ্যমে খেতমজুরদের অধিকার সংরক্ষণ, কৃষিঋণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিপণ্যের ন্যায্যদাম নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, খাস জমিতে সমবায় খামার বা যৌথ খামার গঠন, ভূমি রেকর্ডব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশান, জমি ক্রয়-বিক্রয়ব্যবস্থার সংস্কার, ভূমি প্রশাসনব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ভূমি ব্যাংক ও গবাদী পশু ব্যাংক স্থাপন, পুকুর, দিঘি, জলমহাল, বিল-হাওর প্রভৃতির মালিকানা ও ইজারাব্যবস্থার সংস্কার, নদী-শিকস্তি ও -পয়স্তি জমির মালিকানা ও ইজারাব্যবস্থার সংস্কার, কৃষিজাত পণ্যের দাম-সহায়তা ব্যবস্থার সংস্কার, সেচব্যবস্থায় ওয়াটার লর্ড উচ্ছেদ—এগুলো সবই জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার দাবি রাখে। মনে রাখতে হবে, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও গণচীনের মত এশিয়ার সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে, শিল্পায়নে সাফল্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে এসব দেশে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সুদূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার ও কৃষি সংস্কার কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

২। অর্থনীতির সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং ব্যক্তি উদ্যোগের যৌক্তিকতার সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিমিত মাত্রায় বাজারব্যবস্থাকে উৎপাদন সংগঠনে ব্যবহার করতে হবে। ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো, গণচীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং ইসরায়েল এই ব্যাপারে আমাদেরকে পথ-নির্দেশনা দিতে পারে। উৎপাদনে দক্ষতা অর্জনে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার (স্টেট ফেইল্যুর) আলোকে রাষ্ট্রকে বাজারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক (regulator), সহায়ক (facilitator) এবং শাসকের (governor) ভূমিকায় প্রতিস্থাপিত করতে হবে। রাষ্ট্র উৎপাদকদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। বাজারের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রকে নিয়মনিষ্ঠ রেফারির ভূমিকায় শক্তভাবে হাল ধরতে হবে। বাজার আয় ও সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধি করবেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বাজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সমুন্নত করতে ব্যর্থ হবে, এটা মেনে নিতে হবে। সতের কোটি মানুষের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষারব্যবস্থা বাজার কখনোই করবে না, সতের লাখ ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তানদের জন্যে বাজার উচ্চমানের শিক্ষার আয়োজন গড়ে তুলবে। সতের লাখ উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের জন্যে বাজার উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা জোগান দেবে, কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদ বাজারের থাকবে না, কারণ ঐ মানের স্বাস্থ্যসেবা কেনার ক্রয়ক্ষমতা নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের থাকবে না। দরিদ্র জনগণের মানসম্পন্ন খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান জোগানোর ব্যবস্থা বাজার কখনো করবে না। এ ধরনের বাজার ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলোতে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব পালন করতে দিতেই হবে।

৩। উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় সফল দেশগুলোর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মতো মানব উন্নয়ন ক্ষেত্রে সত্যিকার সফল কোনো দেশ বেশি দিন উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে থাকে না।

অতএব, এ দেশে সর্বজনীন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান-নির্ভর, বৈষম্যহীন ও সকল নাগরিকের অভিগম্য অভিন্ন মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ন্যূনতম সময়ে নিরক্ষরতা নির্মূল করার জন্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ও প্রয়াস চালানো জাতীয় উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান লাভের দাবি রাখে। এ জন্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের সন্তানদের জন্যে একক মানসম্পন্ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক প্রাইমারি ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। উচ্চশিক্ষায় ব্যক্তিখাত এবং রাষ্ট্রীয় খাতের ভূমিকা পাশাপাশি থাকলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানের বৈষম্য যাতে সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের অর্থে বৈষম্যমূলক ক্যাডেট কলেজ, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল-কলেজ, বাংলা মিডিয়াম স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশানি, নোটবই এবং কোচিং সেন্টারের ব্যবসা নিষিদ্ধ করতেই হবে।

৪। একক মানসম্পন্ন আধুনিক, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা পরিচালনা করবে রাষ্ট্র। এ-ব্যাপারে ভারতের কেরালা এবং কিউবা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জনগণের কাছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ রদ করতে হবে, যদিও বিশেষজ্ঞদের প্রাইভেট কনসালটেশনের সীমিত সুযোগ রাখতে হতে পারে।

৫। বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন, রেলওয়ে, শিল্প-কারখানা, পর্যটন—এসব খাতে এখনো রাষ্ট্রকে উৎপাদকের ভূমিকায় কেন রেখে দেওয়া হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এগুলোকে 'পাবলিক ইউটিলিটিজ' বলা হলেও এগুলোর কোনোটাই পাবলিক গুড বা গণদ্রব্য নয়, প্রাইভেট দ্রব্য ও সেবা। আবার, এগুলোর উৎপাদনে প্রাথমিকভাবে অনেক বেশি পুঁজি বিনিয়োগ দরকার হওয়ায় উৎপাদন খরচের মধ্যে স্থির খরচ পরিবর্তনীয় খরচের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে। ফলে, এই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো 'স্বাভাবিক একচেটিয়া কারবারে' (natural monopoly) পরিণত হয়, যেখানে ক্রেতাদেরকে মুনাফাবাজির দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রকে কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হয়। অতীতে এসব খাতে প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে আগ্রহী বা সক্ষম ছিল না বলে রাষ্ট্রকে এগুলোর জোগান দিতে হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এ দেশে দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা কায়েমী স্বার্থ মৌরসী পাট্টা গেঁড়ে বসেছে। এগুলোতে দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অদক্ষতা ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য গেঁড়ে বসায় 'সিস্টেম লসের' যে মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেশের অর্থনীতি ও জনগণকে জিম্মি করে ফেলেছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে দ্রুত এগুলো থেকে রাষ্ট্রকে গুটিয়ে নিতে হবে। এখন আর এসব সেবা ও দ্রব্য উৎপাদনকে রাষ্ট্রের হাতে রেখে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। ব্যক্তি খাতে এ দেশের মোবাইল টেলিফোন কী নাটকীয় গতিতে বিকশিত হয়েছে তা দেখার পরও আমরা এ-ব্যাপারে কালক্ষেপণ করছি কেন? রাষ্ট্রকে এসব ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রতিস্থাপনই এখন সময়ের দাবি।

৬। দেশের ব্যাংকিংব্যবস্থা পুঁজি লুণ্ঠনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্যাংকিংব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ সমস্যা এবং বিভিন্ন পুঁজি লুণ্ঠনের কেলেংকারী থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত শক্তিশালী ও কঠোর regulatory system এবং কার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারব্যবস্থা গড়ে না তুললে ব্যাংকিংব্যবস্থার শনিদশা কাটবে না।

শেয়ারবাজারকে শক্তিশালী না করে ব্যাংকিংকে পুঁজি বাজারের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালনে বাধ্য করা হলে খেলাপি ঋণ সমস্যা ও পুঁজি লুণ্ঠন থেকে ব্যাংকিং সিস্টেমকে মুক্ত করা যাবে না।

৭। উৎপাদন থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের গন্তব্যকে রাষ্ট্র দিকনির্দেশনা দেবে। পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও পুঞ্জীভবনকে রাষ্ট্র প্রতিরোধ করবে, কিন্তু সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরে অর্থবাজার ও পুঁজিবাজারকে রাষ্ট্রীয় কিংবা রাজনৈতিক জবরদস্তির শিকার করবে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যক্তিখাতের উদ্যোগকে রাষ্ট্র কার্যকর সহায়তা দেবে, বড় এবং ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে।

৮। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের জন্যে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে সর্বোতভাবে জনপ্রনিধিত্বমূলক এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বাজারব্যবস্থা ও ব্যক্তিখাতকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতিপক্ষ হিসেবে না দেখে পরিপূরকের ভূমিকা পালনের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে বাজারব্যবস্থা governed market-এ রূপান্তরিত হয়।

৯। অর্থনীতির যাবতীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা ও মেধার যথাযথ প্রণোদনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। একইসাথে জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।

১০। রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধারণ ও লালন করতে হবে। একের ধর্ম পালন অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না করে সে জন্য সজাগ প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে রাষ্ট্র। এমনকি আস্তিকতা-নাস্তিকতা প্রশ্নেও কোনো পক্ষাবলম্বন করবে না রাষ্ট্র। একইসাথে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অপপ্রয়াসকে কঠোরভাবে দমন করবে রাষ্ট্র।

১১। দেশের বিচারব্যবস্থাকে নির্ভেজাল স্বাধীনতা দিতেই হবে। বিচারব্যবস্থা যেন সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকে তারও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

১২। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ক সংস্থার ছড়াছড়ি, রাষ্ট্রীয় সিভিল আমলা ও মিলিটারি অফিসারদের বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে গণবিরোধী 'শ্রেণি'তে রূপান্তর, স্বজনপ্রীতি ও দলবাজি পরিহার করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনোই বিকল্প নেই। তাই, উপজেলা ব্যবস্থা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি নির্বাচিত জেলা গভর্নর পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক।

১৩। সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশনের মতো মতপ্রকাশের মাধ্যমগুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, সাহিত্য, সিনেমা ও নাট্য চর্চাকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে।

১৪। উৎপাদনকে দক্ষ ও গতিশীল করার প্রয়োজনে রাষ্ট্র পর্যাপ্ত ও আধুনিক ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলবে, তবে সেগুলোর পরিচালনায় মাঠপর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এবং সংগঠিত ব্যক্তিখাতের উদ্যোগ কার্যকর এজেন্ট হতে পারে।

১৫। প্রতিরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র শুধু বৃহদাকার সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সমগ্র জনগণের অংশগ্রহণমূলক রিজার্ভ গণবাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলবে, যাতে বৈদেশিক আগ্রাসনের আশঙ্কা দেখা দিলে পুরো জাতিকে ন্যূনতম সময়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া যায়। উপর্যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে যে

সরকারি ব্যয় সাশ্রয় হবে রাষ্ট্র তা বরাদ্দ করবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে।

১৬। রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিই বর্তমান পর্যায়ে দেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। দুর্নীতি ও লুটপাট দেশের পুরো উৎপাদনব্যবস্থাকে যেভাবে তছনছ করে দিচ্ছে তা মোকাবিলা করার জন্যে রাষ্ট্র দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর ও সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে এবং সংবিধানে বিধৃত ন্যায়পালব্যবস্থা অবিলম্বে কায়েম করবে। দুর্নীতি দমনে আন্তরিক না হলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র পরিবর্তনের যাবতীয় আয়োজন শুধুই নামকাওয়াস্তে বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই হবে না।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থপঞ্জি

Acemoglu, D. and J. A. Robinson 2012, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, Random House Inc. New York.

Amin, S. 1976, *Unequal Development,* Harvester Press, Hassocks, and Monthly Review

Press, New York, originally published in French in 1973.

Amin, S. 1977, *Imperialism and Unequal Development*, Harvester Press, Hassocks and

Monthly Review Press, New York, Originally published in French in 1976.

Baran, P. 1957, *The political Economy of Growth,* Penguin, Harmondsworth.

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৮, *Statistical Yearbook of Bangladesh 2018,*ঢাকা, বাংলাদেশ।

Faaland, J. & J. Perkinson, 1975, *Bangladesh: The Test Case of Development,* University Press limited, Dhaka.

Franda, M. 1982, *Bangladesh: The First Decade*, South Asia Publishers, New Delhi.

Frank, A. G. 1969, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, New York, Modern Reader Paperbacks, first edition published in 1967.

Islam, M. 2009, *The Poverty Discourse and Participatory Action Research in Bangladesh*, Research Initiatives, Bangladesh (RIB), Dhaka.

ইসলাম, ম. ২০১৭, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র ও অনুন্নয়ন: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে*, শৈলী প্রকাশন, চট্টগ্রাম।

Islam, M. 2019, *Role of the State in Bangladesh's Underdevelopment*, Manuscript Accepted

For Publication and being printed by the University Press Limited, Dhaka.

Kochanek, S. A. 1993, *Patron-Client Politics and Business in Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.

Kuznets, S. 1966, *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread*, New Haven, Yale University Press.

Piketty, T. 2014, *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Sen, A. 1999, *Development as Freedom*, Alfred Knopf, New York.

Sobhan, R. 1982, *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh*, University Press Limited, Dhaka.